নিশির ডাক

শাহরিয়ার কবির

বাংলাপিডিএফ.নেট
এক্সক্লিউসিভ!

নিশির ডাক

শাহরিয়ার কবির

শিখা প্রকাশনী

গ্রন্থ স্বত্ব
অর্পিতা শাহরিয়ার

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

দ্বিতীয় প্রকাশ
বই মেলা ১৯৯৬

প্রকাশক
কাজী মোহাম্মদ শাহজাহান
শিখা প্রকাশনী
৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০
দূরালাপনী ২৩ ৫২ ৫৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মুদ্রণ কম্পিউটার্স
১৫৬, কো-অপারেটিভ মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
মিরপুর-১, ঢাকা, ফোনঃ ৮০২২৯২

মুদ্রক
প্রভাতি প্রিন্টার্স
৪৬, লাল মোহন সাহা ষ্ট্রিট, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
রফিকুন্নবী

পঞ্চাশ টাকা

NISHIR DAAK
(A collection of juvenile stories), by Shahriar Kabir, Published by Shikha Prokashoni, 65 Pyari Das Road, Dhaka-1100, First Published, February 1990. Price **TK 50.00 only.**

উৎসর্গ

নাজমা জেসমিন চৌধুরীর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে
ছোটদের জন্য অপরিসীম ভালবাসায়
যাঁর হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ

লেখকের কথা

ভূত বলে কিছু না থাকলেও ভূতের গল্প শুনতে কে- না ভালোবাসে!

ছোটবেলায় থাকতাম পুরোনো ঢাকার ওয়াইজ ঘাটে, বুড়িগঙ্গার ধারে বালিয়াটির জমিদারদের বিশাল এক রিক্যুইজিশন করা বাড়িতে। গল্প জানতেন জেঠিমার এক কাকি। আশির ওপর বয়স ছিলো, খুর খুর করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। বলতেন, 'বুড়ো বয়সে আমাকে তোরা কোথায় এনে ফেললি? এ বাড়িতে যে তেনারা আছেন!'

তেনাদের নাম নিতেন না তিনি। সাত-সকালে, ভর দুপুরে, পড়-বিকেলে,ভর-সন্ধায় কিম্বা রাতবিরাতে তেনাদের নাম উচ্চারণ করতেন না। তার মানে বুঝতেই পারো, কখনও তাদের নাম মুখে নিতেন না। প্রায় সন্ধ্যায় গল্প শোনাতে বসতেন, অর্ধেক শেষ না হতেই কোন এক কাজের কথা মনে পড়ে যেতো। বলতেন, 'আজ এই থাক, কাল শুনিস।' ভূতের গল্প বলতে গিয়ে তিনি নিজেই ভয়ে সিটিয়ে যেতেন।

ভূতের গল্প শোনার মজা তখনই পেয়েছিলাম। ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢোকার পর ছোটদের জন্য যখন লেখা শুরু করলাম, তখন বেশি লিখতাম এ্যাডভেঞ্চার আর ভূতের গল্প। ছোটরা এসব গল্প বেশি পছন্দ করতো। 'কচি ও কাঁচায়' অন্যরকম গল্প লিখলেই আমার নাম করে দাদাভাইকে ক্ষুদে পাঠকরা চিঠি লিখতো' --------শিরোলের শয়তানের মত গল্প লেখেন না কেন', বলে। দাদাভাইও আমাকে জব্দ করার জন্য এসে সে সব চিঠি পত্রিকায় ছেপে দিতেন। 'শিরোলের শয়তান' ছিলো আমার প্রথম গল্প। বেরিয়েছিলো প্রায় দুই যুগ আগে। সেই ক্ষুদে পাঠকরা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।

দিব্যি চাকরি বাকরি করছে, বিয়ে থা করে কেউ ঘর-সংসারও করছে। অনেকে বাবা-মাও হয়ে গেছে। বড় হলে কি হবে, সবার ভেতরে যে একটা ছোটদের মন লুকিয়ে থাকে, তাকে সব সময় কি আর লুকিয়ে রাখা যায়! দেখা হলেই বলে, 'সেই গল্পগুলো তো কোন বইয়ে দেখলাম না।' আমি বলি,' আজকালকার টেলিভিশন, ভিসিআর দেখা ছোটরা কি ওসব গল্প পছন্দ করবে?' ওরা বলে, 'বের করেই দেখুন না!'

সেই দেড় যুগ দুই যুগ আগের ক্ষুদে পাঠকদের চাহিদা মেটানোর জন্যই এসব লেখা বইয়ের আকারে বের করা হলো। রাঙাদাদু আগে ছিলো না। গল্পগুলো জোড়া লাগানোর জন্য তাকে আনতে হয়েছে। যে জন্যে প্রথম গল্পটা আগাগোড়া নুতন করে লিখতে হয়েছে। শেষেরটা গল্প না বলে এ কাহিনীর উপসংহার বলা উচিৎ। আলাদা গল্প হলেও আরব্য উপন্যাসে যেভাবে গল্প বলা হয়েছে সেরকম একটা কিছু করার চেষ্টা করেছি। যাদের জন্যে লেখা তাদের ভালো না লাগলে আমাকে কেউ দুষতে পারবে না। আমি চেয়েছিলাম নাকি এসব বের করতে!

শা. ক.

ছোটদের জন্য
লেখকের অন্যান্য বই

পুর্বের সূর্য
নুলিয়াছড়ির সোনারপাহাড়
হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা
আবুদের এ্যাডভেঞ্চার
একাত্তরের যীশু
সীমান্তে সংঘাত
হানাবাড়ির রহস্য
মিছিলের একজন
নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা
পাথারিয়ার খনি রহস্য

সূচী

নিশির ডাক
নিশাচরের বাড়ি
শিরোলের শয়তান
প্রকৃতির প্রতিশোধ
রাঙাদাদু আসলে কে

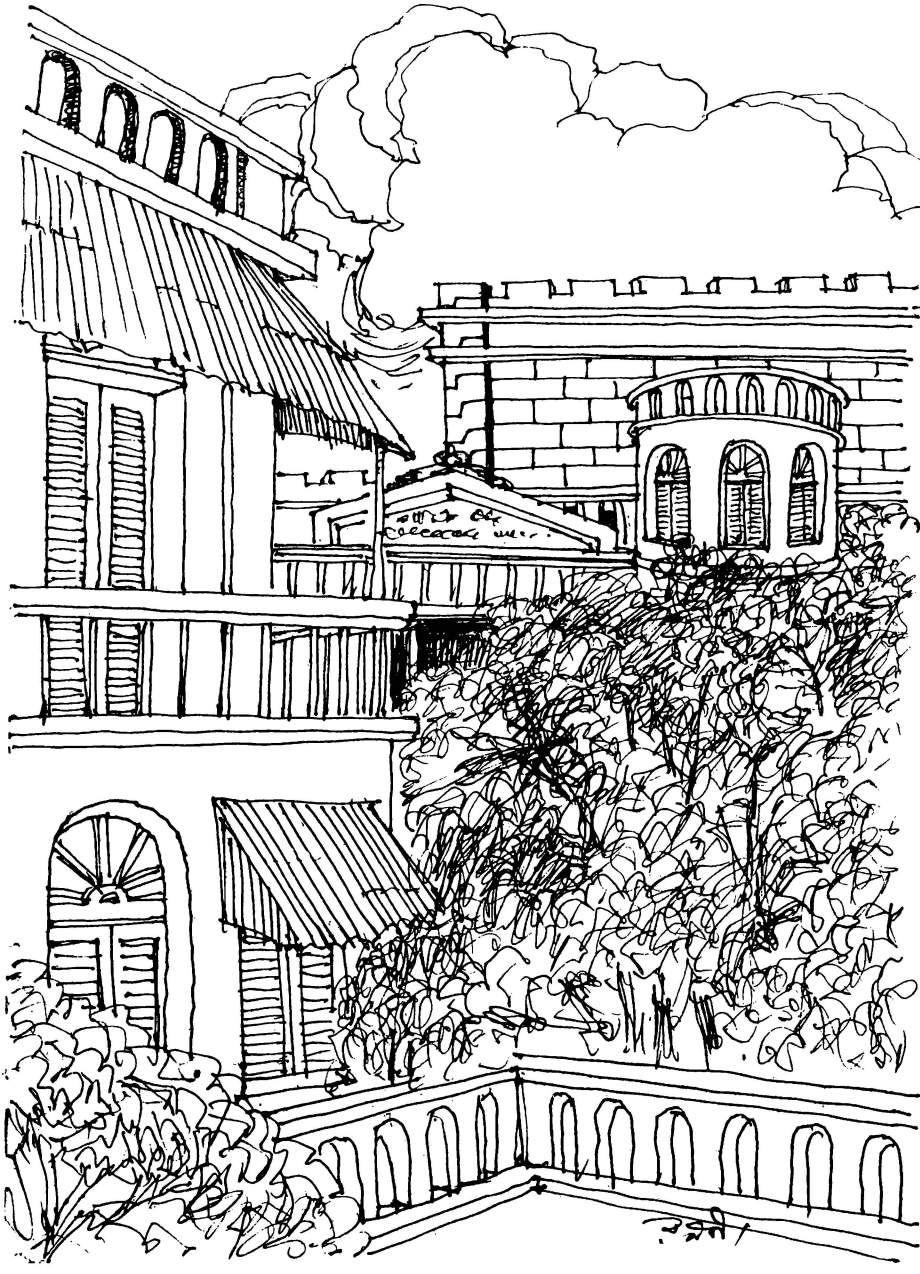

নিশির ডাক

পুরোনো ঢাকার কাগজীটোলায় শামুদের দুর্গের মতো বাড়িটা কে কবে বানিয়েছিলো কেউ বলতে পারবে না। এক কালে নিশ্চয়ই দেখার মত ছিলো। বহুদিন মেরামত না হওয়াতে বাইরের পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে গেছে। ছাদের ফাঁকে ফাটলের ভেতরে বটগাছ গজিয়েছে। চাকরদের ছটা ঘরের তিনটারই ছাদ ধসে পড়েছে, সদরের সিং দরজার একটা সিংহের মাথা নেই, আরেকটার লেজ আর পেছনের একটা পা খসে পড়েছে, ছিরি ছাঁদ বলতে কিছুই নেই।

ইংরেজরা এদেশ থেকে যাওয়ার পর শামুদের বড়দাদু হাজী রইস উদ্দিন খান পাঠান কলকাতার খিদিরপুরের বাড়িটা বদল করেছিলেন ঢাকার কাগজীটোলার অক্ষয় কুমার সরকারদের এই হাড় জিরজিরে বাড়িটার সঙ্গে। পাড়ার লোকেরা বলে অকা সরকারদের বাড়ি বাইরে দেখতে যত খারাপ হোক-কোথায় নাকি সাত ঘড়া আকবরি মোহর পোঁতা আছে।

সরকারদের কোন এক পূর্ব পুরুষ কোম্পানির আমলে ফাঁসুড়েদের সঙ্গে জুটে গিয়ে অনেক পয়সা কামিয়েছিলেন। ফাঁসুড়ে মহলে তাঁর ভারি নামডাকও ছিলো। এ বাড়িতেই মরেছিলেন অপঘাতে, যেভাবে নাকি ফাঁসুড়েদের মরণ কপালে লেখা থাকে। মরবার আগে বলেছিলেন, সাত ঘড়া মোহর পোঁতা আছে এ বাড়িতে, আমার পাপের ধন নয়---। কথা শেষ না করেই তিনি পরলোকে চলে গেলেন। সবাই ডাক ছেড়ে কাঁদলো, কেউ মানুষটার শোকে, কেউ মোহর না পাওয়ার শোকে। নগা সরকার মরার পর বছর ধরে খুঁজেও সেই মোহরের সন্ধান কেউ পায় নি।

বাড়ি বদলের সময় অকা সরকার শামুর দাদাকে বলেছিলেন, আমাদের তো পুরোনো পাপীর বংশ, কেউ লক্ষীর কৃপা পেলো না। দেখুন খুঁজে, আপনাদের কপালে যদি থাকে।

বড়দের কারো অবশ্য এ নিয়ে খুব একটা উৎসাহ ছিলো না। পুরোনো বাড়ি নিয়ে কত কিছুই তো বলা হয়। কেউ কথা তুললে শামুর বড় বিবিদাদু বলতেন, এসব হলো তিন কেলে অকা সরকারের বেলাফ। বললেই হলো সাত ঘড়া মোহর! সত্যিই থাকতো

যদি তাহলে এ রকম বাড়ি সাত বার ভেঙ্গে সাত বার বানানো যেতো। সাত ঘড়া আকবরি মোহর সোজা কথা নয়। ওসব উল্টো- সিধে বলেই বিটকেল বুড়োটা তোদের বড়দাদুকে ভজিয়েছে।

বড়দের উৎসাহ না থাকলেও, ছুটির দিনে দুপুরে সবাই যখন ঘুমোতো, ছোটরা দল বেঁধে বেরুতো গুপ্তধন খুঁজতো। দেড় হাত পুরু,পাতলা চৌকো ইটের সুরকিগাঁথা দেয়ালে লাঠি ঠুকে দেখতো কোথাও ফাঁপা শব্দ হয় কিনা। বাড়ির পেছনে বড় বড় আশ শ্যাওড়া, নিশিন্দা গাছের ফাঁকে ভাট, আকন্দ, বনতুলসী আর লজ্জবতীর কাঁটা ঝোপের ভেতর যেখানে পিপড়ে পর্যন্ত ঢোকে না--সব খোঁজা হয়ে গেছে। ছোড়দাদু একদিন এক গাল হেসে বললেন, পেছনের জমিটা ভালো করে খুঁড়ে দেখিস তো। আমার তো সন্দ হচ্ছে ওখানে কিছু থাকতে পারে।

সবাই হই হই করে শাবল কোদাল দিয়ে ঝোপ ঝাড় সব উপড়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলো। শেষে ছোড়দাদু বললেন, ঢের হয়েছে, এবার আমি ওখানে বেগুনের চারা বুনবো। আকবরি মোহরের চেয়ে খেতে আশা করি ভালোই লাগবে। শুনে ছোটদের কেউ কেউ কেঁদে ফেললো।

বড় বিবিদাদু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হাবু তোদের বেলাফ দিয়েছে, তোরাও অমনি নেচে উঠলি। তোরা অযথা হযরান হচ্ছিস। সাত ঘড়া মোহর যদি এ বাড়িতে কেউ পুঁতেও থাকে, সোয়া'শ বছর পরে ওসব কি এক জায়গায় বসে আছে? কখন হেঁটে হেঁটে যখের কাছে চলে গেছে! যখ যখন চাইবে তখনই ওই গুপ্তধনের হদিশ তোরা পাবি। তার আগে নয়।

বাইরে থেকে শামুদের কামিনী কুটিরকে খেতে না পাওয়া বেতো ঘোড়ার মত দেখালে কি হবে ভেতরটা বেশ ভালোই বলতে হবে। দেড় দু'হাত পুরু দেয়াল, খোপ কাটা পাথরের মেঝে, শাল কাঠের ভারি দরজা জানালা, ছাদের তলায় লোহা কাঠের মোটা কড়ি বরগা তা সব মিলিয়ে একটা বনেদি আমেজ ছিলো। ওপর নিচের দুই তলায় একুশটা ঘর। দারোয়ান, চাকরদের ঘর আলাদা। শামুদের বাড়িতে লোকজনও কম ছিলো না। বড় দাদু আর ছোড়দাদু তাঁদের এক ডজন ছেলে মেয়ে, দেড় ডজন নাতি নাতকোর সবাই যখন ঈদ-উৎসবে জড় হয়, তখন সারা বাড়ি গম গম করে। অবশ্য শামুদের ফুপুরা কেউ এ বাড়িতে থাকে না। মেজো দাদু আর রাঙা দাদুও নয়। মেজো দাদু থাকেন রেঙ্গুনে, সেখানেই বর্মী দাদিকে নিয়ে থিতু হয়ে বসেছেন। আর রাঙাদাদু যে কখন কোথায় থাকেন তার হদিস কেউ জানে না। বছরে এক আধটা চিঠি আসে, কখনও তাও নয়, তামাম দুনিয়া চড়ে বেড়াচ্ছেন, আজ এখানে, কাল ওখানে। রাঙাদাদু বাড়ি থেকে প্রথম পালিয়েছিলেন আঠারো বছর বয়সে। সে আমলে চৌদ্দ বছরে এন্টান্স পরীক্ষা দেয়া যেতো। ডিগ্রী পরীক্ষায় অঙ্কে লেটার পান নি বলে দাদু তাঁকে খড়মপেটা করেছিলেন। রাগ করে সেই যে বাড়ি ছাড়লেন, এলেন, কামিনী কুটিরে বাড়ি বদলের পর। সেও ষোল সতেরো বছর আগের কথা। বাড়ির কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি। লম্বা দাড়ি রেখেছেন, আলখাল্লা পরনে, গলায় তসবি, মাথায় লাল রুমি টুপি-চেনার কোন

উপায় থাকলে তো! বয়স তখন ষাটের কাছে। বললেন,কবে বাঁচি মরি আল্লা মালুম। ভাবলাম মরবার আগে বংশের বাতিগুলোকে দেখে যাই। বড় বিবিদাদু বললেন, আবার কোথায় যাবে। ঘর সংসার কিছুই করলে না, এবার থিতু হয়ে বসো।

একগাল হেসে রাঙাদাদু তখন বলেছিলেন, এত যে ঘুরলাম, তবু মনে হয় কিছুই দেখি নি। ভাগ্যিস বড়দা খড়ম দিয়ে মেরেছিলেন। নইলে আল্লার দুনিয়ার কত কিছু অজানা থেকে যেতো। এখনও অনেক কিছু বাকি আছে দেখার।

এরপর মাস না পেরুতেই একদিন হঠাৎ করে চলে গেলেন। নাকি স্পেনে তাঁর কোন বন্ধু মৃত্যু শয্যায় স্বপ্নে তাঁকে দেখতে চেয়েছেন মরার আগে, কি সব জরুরী কথা আছে। রাঙাদাদুর কথা শামুর বড় বিবিদাদুর কাছে শুনেছে। ওদের কেউ তাঁকে দেখেনি। বহু বছর জাহাজে চাকরি করেছেন রাঙাদাদু, বন বিভাগে চাকরি নিয়ে আসামের জঙ্গলে ছিলেন অনেক দিন, কয়েক বছর বিজাপুরের রাজার ছেলের হাউস টিউটর ছিলেন। সেখানে কি এক গন্ডগোলে ফেঁসে গিয়ে দেশান্তরি হলেন, বহু দিন কোন খবর নেই হঠাৎ এক চিঠি এলো সোমালিয়া থেকে। বড় বিবিদাদু যখন রাঙাদাদুর গল্প বলতেন তখন শামুদের মনে হতো কবে বি এ পরীক্ষা দেবে, কবে বড়দাদুর খড়মপেটা খেয়ে বেরিয়ে পড়বে! জাহাজে জাহাজে বন্দর থেকে বন্দরে, পাহাড়ে, জঙ্গলে আর মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে! রাঙাদাদু ছিলেন ওদের কাছে আরব্য উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা সিন্দাবাদ নাবিকের মতো।

সেদিন বিকেলে শামুদের কাগজীটোলা বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে গেণ্ডারিয়ার পাঁচ তারা ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ ছিলো ধুপখোলার মাঠে। খেলায় তিন গোলে হেরে সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফিরে সবাই মুখ কালো বসেছিলো ঝুল বারান্দার নিচে সিড়িতে। শামু, মন্টু, হাবুল আর ছোটন- এ বাড়ির এক বয়সী চারজনই ছিলো দলে। শামুর চেয়ে তিন বছরের ছোট রামু সঙ্গে গিয়েছিলো খেলা দেখতে। বললো, শিকদার বাড়ির ঘোতনাকে তোদের দলে রাখা ঠিক হয় নি দাদা। আমি শুনেছি ওদের কালুকে দলে নিস নি বলে ও ঘোতনাকে বলেছে, ইচ্ছে করে গোল খাবি, কামিনী কুটিরঅলাদের কাপ্তানী চলবে না।

শামু খেঁকিয়ে উঠে বললো, এ কথাটা হাফ টাইমে বলতে পারতি না-ঘোতনাকে বসিয়ে জগুকে নামাতাম?

মন্টুর বোন চুমকি এসে ডাকলো, ছোড়দা, বড় বিবিদাদু তোদের ডেকেছে দুধ মুড়ি খেয়ে যেতে।

মন্টুও শামুর মতো খেঁকিয়ে উঠলো, যা এখান থেকে। আমাদের যখন খুশি তখন যাবো।

ছোটন দাঁতা কিড়মিড় করে বললো, শিকদার বাড়ির ছেলেদের এক হাত দেখে নেবো।

ঠিক তখনই ওরা দেখলো, সদর দরজার সামনে রিক্সা থেকে নামলেন এক বুড়ো। সাদা আলখাল্লা পরনে, লম্বা সাদা চুল দাড়ি, ফর্শা গায়ের রঙ ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথ। চামড়ার একটা সুটকেস হাতে নিয়ে ওদের কাছে এসে মৃদু হেসে বললেন,

তোমরা কি এ বাড়ির ছেলে?

ওরা মাথা নেড়ে সায় জানালো। শামু জানতে চাইল, আপনি কার সঙ্গে দেখা করবেন?

দেখা তো সবার সঙ্গে করবো। একগাল হেসে বুড়ো বললেন, আমাকে নিশ্চয় তোমরা চিনতে পারো নি। চেনার অবশ্য কথাও নয়। শেষবার যখন এলাম তোমাদের কাউকে দেখি নি।

আপনি রাঙাদাদু! সবার চোখ কপালে উঠে গেলো।

চুমকি আর রামু রাঙাদাদু এসেছে, রাঙাদাদু এসেছে, বলে এক দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলো। শামুরা কোন কথা বলার আগে বড় বিবিদাদু বেরিয়ে এলেন– কোথায় রাঙা, এত বছর পর বুঝি বাড়ির কথা মনে পড়লো এইসব বলতে বলতে।

বড় বিবিদাদুকে দেখেই রাঙাদাদু এগিয়ে এসে ওঁর পা ধরে সালাম করলেন। বললেন, তোমরা কেমন আছো। ভাবীজি। বড়দা হাবু ভালো আছে তো? গত বছর রেঙুন গিয়েছিলাম। মেজদারা সব ভালোই আছে। তুমি অনেক বুড়ো হয়ে গেছো ভাবীজি।

আশির ওপর বয়স হলো, এখনও কি ছুঁড়ি থাকতে বলিস নাকি! তুই ও তো অনেক বদলে গেছিস। ফর্সা হয়েছিস অনেক। গতবার যখন তোকে দেখলাম এত ফর্সা ছিলি না। শীতের দেশে থাকলে কালো কাফ্রিও ফর্সা হয়ে যায়। এবার এলি কোত্থেকে?

লাজুক হেসে রাঙাদাদু বললেন, তিব্বত গিয়েছিলাম, কি চমৎকার জায়গা! ভেবেছিলাম বেশি দিন থাকবো। তা আর হলো না। চীনে কমিউনিষ্ট রাজত্ব হওয়ার পর আমি দ্বিতীয় বিদেশী যে তিব্বত দেখেছে। নেহাৎ পিকিং ইউনিভার্সিটির আর্কিঅলজির প্রফেসর কুইলান আমার বন্ধু ছিলো বলেই যেতে পেরেছিলাম।

তিব্বতের গল্প পরে শুনবো, ঘরে আয়, মুখ হাত ধুয়ে চাট্টি মুখে দিবি।

শামুরা মন্ত্র মুগ্ধের মতো রাঙাদাদুর কথা শুনছিলো। বড় বিবিদাদু বাধা দেওয়াতে ওরা একটু মনক্ষুন্ন হলেও রাঙাদাদু ফিরে এসেছেন––সেই উত্তেজনায় আর আনন্দে ফুটবল ম্যাচ হারার দুঃখ যে কোন ফাঁকে কর্পূরের মতো উবে গেছে কেউ টেরও পেলো না।

• রাতে খাওয়ার পর সবাই রাঙাদাদুকে নিয়ে টানা বারান্দার এক কোনে সতরঞ্জি চাদর বিছিয়ে বসলো। রাঙাদাদু বাইরের ঝুল বারান্দায় বসতে চেয়েছিলেন কি চমৎকার সামার ওয়েদার বলে।

গায়ে হিম লাগবে বলে বড় বিবিদাদু বারণ করলেন বাইরে বসতে। পৌষ মাস সবে শুরু হয়েছে। শীত জাঁকিয়ে না পড়লেও মাঝে মাঝে নদী থেকে উঠে আসা ঠান্ডা বাতাস গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

ছোড়দাদু গায়ের আলোয়ানটা ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে বললেন রাঙাদা এবার বুঝি তিব্বত থেকে এলে?

রাঙাদাদু মৃদু হেসে সায় জানাতেই শামুর বাবা জানতে চাইলেন, তিব্বতের আগে

কোথায় ছিলে রাঙা কাকু?

তিব্বতের আগে ছিলাম সিয়ানে। চীনের সম্রাটদের আমলে ওটাই ছিলো রাজধানী। পিকিঙ থেকে গিয়েছিলাম সিয়ান। প্রফেসার কুই লানের ধারণা সিয়ানের মাটির তলায় পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতার হদিস মিলতে পারে।

চুপচাপ ফারসী আলবোলায় তামাক টানছিলেন বড়দাদু। তামাকের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ টানার পর নলটা রাঙাদাদুর দিকে বাড়িয়ে দিতেই তিনি কাচুমাচু হয়ে বললেন, না থাক বড়দা আপনার সামনে। কি লজ্জার কথা।

বড়দাদু বললেন, তোর বয়স ছিয়াত্তর হতে চলেছে। লজ্জার কিছু নেই।

লাজুক হেসে আলবোলার নলে কয়েক টান দিয়ে রাঙাদাদু বললেন, কাল তোমাকে আমি নিজ হাতে তামাক বানিয়ে খাওয়াবো, ইস্তাম্বুলের রইস লোকেরা যেমনটি খায়।

বড়দাদু হেসে বললেন, সেবার তুই এসেছিলি পার্টিশনের এক বছর পর। ষোল বছর হতে চললো, এত দিন কোথায় কিভাবে ছিলি সব বলবি তো।

কয়েকবার আলাবোলার নলটা টেনে বড়দাদুর হাতে ওটা ফেরত দিয়ে রাঙাদাদু বললেন, প্রথমে তো গেলাম কর্ডোভা। বন্ধুর সঙ্গে শেষ দেখা করে ভেবেছিলাম মালয়ের দিকে যাবো। হঠাৎ করে ত্রিবান্দ্রমে পুরোনো জাহাজটা পেয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে নোয়াখালির যে ছোকরাটা রসুইয়ে ঢুকেছিলো, ও তখন হেডকুক হয়েছে। সেদিনের সেই ছোকরার দেখি একগাল পাকা দাড়ি। বললো বয়স নাকি ষাট পুরেছে।

বড়দাদু বললেন, সেবার তোর বয়সও ষাটের কাছে ছিলো।

নিজের বয়স আমার কোন কালেই মনে থাকে না। মনে হয় এই তো সেদিন তোমার খড়মপেটা খেয়ে বাড়ি ছাড়লাম।

ছোড়দাদু বললেন, তারপর নোয়াখালির ষাট বছরের ছোকরা তোমার কি করলো তাই বলো। খড়মপেটার কথা অনেক শুনেছি।

এক গাল হেসে রাঙাদাদু বললেন, আর কি করবে। জোর করে ধরে নিয় নতুন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ডাচ ক্যাপ্টেন বললো, চলে এসো আমাদের সঙ্গে। তোমার কথা আমি শুনেছি। উঠে পড়লাম আমার সেই পুরোনো জাহাজে। সুদান, মিশর ঘুরে আন্দালুশিয়া গিয়ে আটকে গেলাম। কি করবো বলো। বাজারে ঘুরছি হঠাৎ এক ডাকসাইটে বড় লোক বুড়ি আমাকে তার ছেলে ভেবে বসে থাকলো। বুড়ির বয়স নব্বই পেরিয়েছে, চোখেও ভালো দেখে না, বলে আমি নাকি তার হারানো ছেলে, যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসি নি। বললাম, আমি সে ছেলে নই। বুড়ি বললো, বাঁচবো আর কদিন, কোন কথা শুনছি না, আমার কাছে থাকবে তুমি। এরপর শুরু হলো ফোঁৎ ফোঁৎ কান্না। কি আর করি! থেকে গেলাম। বছর তিনেক পর বুড়ি বেহেশতে গেলো। আমাকেও সুযোগ বুঝে নিশি ডাকলো। আবার বেরিয়ে পড়লাম।

নিশির কথা রাখো। তবে যে বললে বড় লোক বুড়ি। সয়সম্পত্তি কিছুই দেয়নি বুঝি। জানতে চাইলেন বড় বিবিদাদু।

ভাবলাম মরবার আগে বংশের বাতিগুলোকে দেখে যাই---

তা কেন দেবে না? রাঙাদাদু বললেন, সবই তো লিখে দিয়েছিলো। ওসব সামলাতে গেলে যে থাকতে হতো সেখানে। তিন বছর একটানা এক জায়গায় থেকে এমনিতে দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। তার ওপর সম্পত্তি দেখা! ভাগ্যিস নিশি ডেকেছিলো। বুড়ির সয়সম্পত্তি সব এতিম খানায় দিয়ে হাত খরচাটা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

রাঙাদাদুর ঝুলিতে যে কত বিচিত্র সব গল্প ছিলো বলে শেষ করা যাবে না। আগে বড় বিবিদাদুর কাছে শামুরা ওর অনেক কথা শুনেছে। তবে শোনা আর দেখার ভেতরে যে বিস্তর ফারাক এ কথা বড় বিবিদাদু প্রায়ই বলেন। রাঙাদাদুর গল্প শুনে মনে হয় চোখের সামনে সে সব ঘটছে।

রাঙাদাদুকে নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকার মতো যথেষ্ট সময় বড়দের না থাকলেও ছোটদের ছিলো। স্কুলের বছর শেষের পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফল বেরিয়ে গেছে, ক্লাস শুরু হতে ঢের দেরি, রাঙাদাদু না এলে বুঝি সময়টা মরুভূমি হয়ে যেতো। কাঁহাতক আর পাড়া বেপাড়ায় ম্যাচ খেলার জন্য ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ানো যায়। রাঙাদাদুকে পেয়ে ওরা আকাশের চাঁদ হাতে পেলো।

রাঙাদাদুর বাগান করার ভারি সখ। দুদিন পরই -বাড়ির সামনে এরকম মরুভূমি বানিয়ে রাখার কোন মানে হয়? বলে বদনার বাপকে মাটি কোপাতে লাগিয়ে দিলেন। বদনার বাপকে রাঙাদাদু চন্দন কাঠের একছড়া তসবি দিয়েছেন। তাতেই ও আত্মহারা। রাঙাদাদুর মুখ থেকে কথা বেরুতে পারে না, বদনার বাপ সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যায়। বাগান কোপানো দেখতে দেখতে একদিন শামু বললো, রাঙাদাদু এ বাড়িতে যে সাতঘড়া আকবরি মোহর লুকোনো আছে তুমি জানো?

রাঙাদাদু কাষ্ঠ হেসে বললেন, হ্যাঁ গতবার যখন এসেছিলাম তখন তোদের বাপ চাচাদের কে যেন বলেছিলো।

ছোটন বললো, বড় বিবিদাদু বলেছে ওসব নাকি যখের কাছে চলে গেছে।

ঠিকই বলেছো। ফাঁসুদের লুটের ধন। কত রক্ত, কত অভিশাপ ওসবের গায়ে লেগে আছে। ওসব কি চুপচাপ পড়ে থাকার জিনিস!

হাবুল বললো, বদনার বাপ যেভাবে মাটি খুড়ছে হঠাৎ যদি ঢং করে একটা শব্দ হতো!

হলেই বা কি! শুকনো গলায় রাঙাদাদু বললেন, তোমরা কি ভাবছো ওসব পাপের ধন কেউ স্পর্শ করতে পারবে! নাকে মুখে রক্ত উঠে মরতে হবে।

সেদিন রাতে রাঙাদাদু বললেন, তিনি যখন বিজাপুরের রাজার ছেলেকে পড়াতেন তখন রাজার দেওয়ান এরকম গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিলো। ওসব যে যখের নজরে পড়েছে দেওয়ান জানতো না। বাড়িতে এনে তোলার সাত দিনের মধ্যে দেওয়ান নির্বংশ হয়ে গেলো। যেখানকার যখের ধন আবার সেখানে চলে গেলো। গোটা দেওয়ান বাড়ির শান শওকত কিছুই আর রইলো না। বুড়ো দেওয়ান মরার পর ওটা হানাবাড়ি হয়ে গেলো। কত রাতে দেখেছি সাদা শাড়ি পরা দেওয়ানের বড় বিবি অন্ধকারে সিড়ি বারান্দায় বসে

ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। রাঙাদাদুর কথা শুনে সবার গায়ে কাঁটা দিলো। পেছনে বসেছিলো বদনার বাপ। আয়াতুল কুরসি সুরা পড়ে বুকে তিনবার ফু দিলো। বললো, বড় দাদি আম্মারে কতদিন কইছি, এ বাড়ির ছাদে আঁই সাদা কাপড় হিন্দা মাইয়া মানুষ দেইখছি, বিলাফ করি কান্দে।

শামু বললো, সন্ধ্যার পর তোমার কোনদিন হুশ থাকে নাকি বদনার বাপ? চৌধুরি বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে রোজ বুঝি আফিমের গুলি খাও না।

রাঙাদাদু বললেন, এসব পুরোনো বাড়িতে অনেক কিছুই থাকতে পারে। আমাদের পীর বংশ বলে ওরা কোন ক্ষতি করতে পারে না। নইলে নিশি আমাকে ডেকে নিয়ে কবে মেরে ফেলতো?

নিশি কাকে বলে দাদু?

নিশি দেখতে কেমন?

নিশি ডাকলে কি হয়?

ছোটরা সবাই রাঙাদাদুর উপর হামলে পড়লো।

রাঙাদাদু কাষ্ঠ হেসে বললেন, নিশি ডাকলে কি হয় আমাকে দেখে বুঝিস না?

নিশি যাকে একবার ডেকেছে সে যদি কপাল গুনে কখনও বেঁচেও যায়, ঘরে তার মন বসে না। চিরদিনের মতো ঘরছাড়া হয়ে যায়। নিশির জন্য আমার সংসার হলো না। এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাঙাদাদু। তারপর আপনমনে বললেন, নিশি দেখতে কেমন কেউ বলতে পারে না। যারা দেখেছে তারা সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে।

নিশি কেমন করে ডাকে? জানতে চাইলো রুমকি।

রাঙাদাদু বললেন, পর পর তিন বার ডাকে নিশি। কখনও তিন বারের বেশি চার বার ডাকে না। ওখানেই ভুল হয় বনি আদমের। চারবার না ডাকতেই বেরিয়ে পড়ে।

কেমন করে ডাকে তাই বলো না দাদু?

কেমন করে আবার কি! শুকনো গলায় রাঙাদাদু বললেন, মানুষের গলায় ডাকে। মাঝ রাত্তিরে ওদের ডাকে ঘুমের ঘোরে মানুষ উঠে বসে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যারা যায় তাদের বেশির ভাগই বেঘোরে মারা পড়ে। যারা বেঁচে থাকে তারা কোথাও থিতু হতে পারে না।

রাঙাদাদু আসার পর থেকে বদনার বাপের আফিমের আসর মাটি হয়েছে। ঘন্টায় ঘন্টায় তামাক সাজতে হয়। তার জন্য বদনার বাপের কোন দুঃখ নেই, কারণ সেও রাঙাদাদুর গল্প বলার আসরের একজন নিয়মিত শ্রোতা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মন্তব্য করে, রাঙাদাদুও আগ্রহ নিয়ে ওর কথা শোনেন। নিশির কথা উঠতেই বদনার বাপ খাস নোয়াখালির ভাষায় বললো আঁর জেইয়ারে একবার নিশি ডাইকছিল। জেইয়া ঘুমের ভিতরে দরজা খুলি সোজা রওনা অইছে। সামনে আছিল এক হইর।

রাঙাদাদু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, বদনার বাপ যে কি বলো, অর্ধেক বোঝা যায় না। জেইয়া কে, হইর কি বুঝিয়ে বলবে তো!

অপ্রস্তুত হয়ে বদনার বাপ বললো, জেইয়া মানি জ্যাডা আরি, আঁর বাপের বড়

ভাই। আর হইর কয় হুকুররে। গ্যারাম দেশে মাইনষে গোসল করে, মাছ ধরে।

আহ, পুকুর বলো না!

জি হুকুর। হুকুরের রাস্তাতে কি আছিল জেইয়ার খেয়াল নাই, উন্ডা খাই হইড়েছে। আৎকা সজাগ ওই চায়, আন্ধারের ভিতরে হড়ি রইছে। দিলো এক চিল্লানি। কাছে ধারে যত বাড়ি আছিল, ব্যাক মানুষ বাইর ওই আইছিল। নয়ত আঁর জেইয়ারে নিশি হইরেনি ডুবাইতো।

তাহলে ওটা খারাপ নিশি। শুকনো গলায় বললেন রাঙাদাদু।

খারাপ নিশি কাদের ডাকে রাঙাদাদু?

খারাপ লোকদের খারাপ নিশি ডাকে। এই বলে রাঙাদাদু বদনার বাপের দিকে তাকালেন– তোমার জ্যাঠা কি ভালো লোক ছিলো বদনার বাপ?

জ্বে না! সরল গলায় বললো বদনার বাপ– মহাজনি কারবার কইরতো তো সুদ খাইতো। মাইনষেরে কম জ্বলায় ন।

তাহলেই দেখো। আমাকে কতবার প্রাণে বাচিঁয়েছে নিশি। সিসিলিতে সেই যে ভূমিকম্প হলো, সেই মুসোলিনির আমলে, কতলোক মারা গেলো মাঝ রাতে ঘুমের ভেতর বাড়ি ধসে পড়ে। ভূমিকম্প শুরু হওয়ার ঠিক দু মিনিট আগে আমাকে নিশি ডাকলো। সুড় সুড় করে আমি ঘর থেকে বেরুলাম। চল্লিশ কদমও যাই নি, মাটি দুলে উঠলো, পড়ে গেলাম মাঠের ভেতর। পেছনে তাকিয়ে দেখি খেলনার মতো হুড় মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো পাথরের বাড়ির ছাদগুলো। ভালো নিশি না ডাকলে আমার কবর হয়ে যেতো সেদিনই। খারাপ নিশি একবারই ডেকেছিলো এই বলে একটু থেমে রাঙাদাদু বললেন, খারাপ নিশি একবারই ডেকেছিল।

এটুকু বললে হবে না দাদু। ছোটদের কখনও সহজে ভোলানো যায় না। খারাপ নিশি তোমাকে কখন ডেকেছিলো?

সবটুকু বলতে হবে দাদু।

ছেঁড়া ছেঁড়া গল্প বললে শুনবো না।

সব কথা বলি না ভয় পাবি বলে।

রাঙাদাদুর কথায় সবাই হইচই করে উঠলো। আমরা কখনো ভয় পাই না।

তুমি বলেই দেখো না।

টানা বরান্দার এক কোনে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। দেয়ালে মস্ত কালো কালো ছায়া। নদী থেকে উঠে আসা কনকনে বাতাসে মাঝে মাঝে রাঙাদাদুর লম্বা রূপোলী চুল দাড়ি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। চারপশে আম্বুরি তামাকের মিষ্টি গন্ধ। এ বাড়িতে আসার পরদিনই রাঙাদাদু বদনার বাপকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজে খুঁজে বেগম বাজার গিয়ে জাফরানের গন্ধ মাখা খাঁটি আম্বুরি তামাক কিনে এনেছেন। নকশা করা পেতলের ডাবায় কতটা পানির সঙ্গে কতটা গোলাপজল মেশাতে হয়, কি করে কলকেতে তামাক সাজাতে হয়, বদনার বাপকে সব শিখিয়েছেন। বলেন, তুই হলি আমার হুক্কাবরদার। আসছে বার তোর জন্য আমি ইস্তাম্বুল থেকে আকিক পাথরের তসবি আনবো।

গল্পের গন্ধ পেয়ে বদনার বাপ বিগলিত হয়ে বললো, ওক্কার হানি বদলাই দিমু নি?

কয়েকবার গুড়র গুড়র করে নল টেনে রাঙাদাদু বললেন, না থাক। সত্যি বলছিস তো তোরা ভয় পাবি না?

ছোটদের একজন বললো, ভয় কাকে পাবো? ভূত বলে কিছু আছে নাকি?

কে বললো কথাটা? তামাক টানা বন্ধ করে মোলায়েম গলায় জানতে চাইলেন রাঙাদাদু।

সবার চোখ গিয়ে পড়লো শামুর ওপর। এইট থেকে নাইনে উঠে ও সায়েন্স নিয়েছে। স্কুলে নিকোলাস স্যারের কাছে ক'দিন আগেই শুনেছে ভূত টুত বলে কিছু নেই। ভয়ের কথা শুনে শামু সদ্য পাওয়া জ্ঞানটুকু জাহির না করে পারলো না।

রাঙাদাদু বললেন, ভূত আছে এ কথা আমি বলি না। অনেকে অনেক কথা বলে বটে। তবে খাবিস জ্বীন আছে। ওরা নিশির মত নয়, নানা কিসিমের ছবি ধরতে পারে। আমরা যখন খিদিরপুর থাকতাম তখনকার কথা বলছি। আমার এক বন্ধু ছিলো, এক পাড়ায় থাকি, এক স্কুলে পড়ি, ভালো নাম ছিলো গগেন্দ্রনাথ হালদার। আমরা ডাকতাম গনু ।

তুমি তখন কত বড় ছিলে?

কত আর বড় ছিলাম! তোদেরই বয়সী হব। গনুর এক জ্যাঠামশাই ছিলেন। সবাই ডাকতো তান্ত্রিক বলে। দিন রাত শ্মশানে পড়ে থাকতেন। তন্ত্র মন্ত্র সাধনা করতেন। তাঁর কাছে শুনেছি ডাকিনী যোগিনীরা নাকি আসতো। ভারি বদমেজাজি ছিলেন। সংসার করেন নি। এতটুকু বেচাল দেখলে ক্ষেপে যেতেন। তাঁর কথা বলি তোদের।

কোনে কিছু বাদ দিতে পারবে না।

রহস্যময় হেসে আলবোলার নলে কয়েকটা টান দিয়ে গোলাপ আর জাফরানোর মিষ্টি গন্ধ ভরা ধোঁয়া ছেড়ে রাঙাদাদু বললেন, তোরা বোধ হয় জানিস না, ছোট থাকতে আমি ভীষণ পাজি ছিলাম। তোদের মতো ভূত টুত কিছু বিশ্বাস করতাম না। গনুকে নিয়ে কতদিন মাঝরাতে গঙ্গার ধারে শ্মশানে গেছি। বাড়ি থেকে গনুকে বলে দেয়া হয়েছিলো, হপ্তায় দুদিন শ্মশানে গিয়ে জ্যাঠামশাইকে দেখে আসতে। কোন দিন স্কুল ছুটির পর ফুটবল ম্যাচ খেলে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে ফুরিয়ে যেতো। রাতে খেয়ে দেয়ে শুতে যাবো, গনু এসে আমার ঘরের জানালা দিয়ে চাপা গলায় ডাকতো, রাঙা একটু বাইরে আসবি?

গনুর ডাক শুনে বাইরে আসতাম। ও বলতো, চল জ্যাঠামশাইকে দেখে আসি। দিনে যাই নি। বাবা জানতে পারলে আস্ত রাখবে না।

গনুর জ্যাঠামশাইকে যে কোন লোক প্রথম দেখলেই ভয় পেতো। বিশাল শরীর, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত, চুলদাড়ি সব জট পাকিয়ে গেছে। মেঘের মত গলার স্বর। আমাদের দিনে দেখলে কিছু বলতেন না। তবে একদিন

রাতে ভীষণ বকেছিলেন। বলেছিলেন, খবরদার সন্ধ্যের পর এ শ্মশানে পা রাখিবি না। বকুনি খাওয়ার পর রাতে কখনও গেলে ওঁর সঙ্গে আর দেখা করতাম না। দূর থেকে দেখে চলে আসতাম। দিনে তিনি থাকতেন শ্মশানের পাশে এক পোড়ো মন্দিরে। ভক্ত ছিলো কিছু। তারা খাবার-টাবার দিয়ে যেতো। রাতে শ্মশানে আগুন জ্বালিয়ে বসে কি সব করতেন। লোকে বলতো, তিনি নাকি প্রেত সাধনা করেন।

আমি আর গনু খুব ভালো ফুটবল খেলতাম। ও ছিলো গোল কিপার, আমি ক্যাপ্টেন, সেন্টারে খেলি। মাঝে মাঝে অন্য পাড়ার ছেলেরা দূরে কোথাও খেলতে গেলে আমাদের নিয়ে যেতো। সেবার টালিগঞ্জ বয়েজ ক্লাব আমাদের নিয়ে গেলো ডায়মন্ড হারবারের কাছে খেলতে। বললো, রাতে ভোজ হবে, তার ওপর পাঁচ টাকা করে দেবে, যদি জিততে পারি।

কে যেন বললো, তোমরা তখন ভাড়া খাটতে বুঝি?

আরেকজন বললো, আহ, চুপ কর। দাদুকে বলতে দে।

রাঙাদাদু বললেন, গল্পের মাঝখানে প্রশ্ন করলে আমার অসুবিধে হয়।

সবাই তখন ছোটনকে পারলে তখনই উঠিয়ে দেয়। রাঙাদাদু বাধা দিলেন থাক, হল্লা করতে হবে না। যা বলছিলাম। আমি বাড়িতে বলে গিয়েছিলাম রাতে ফিরবো না। গনুর অবশ্য সুবিধে ছিলো। ওদের বাড়ির সবাই সেবার গয়া না কাশী গিয়েছিলো কি উপলক্ষে।

বাসে করে গেলাম ছ' সাত মাইল দূরে এক অজ পাড়া গায়ে। কোন জমিদার নাকি রূপোর কাপ দিয়েছেন তার মায়ের নামে। ভবতারিনী না জগত্তারিনী সিলভার কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট।

আমাদের বলা হয়েছিলো কিশোর ফুটবল টুর্নামেন্ট। খেলতে গিয়ে দেখি আমাদের অপোনেন্ট প্লেয়ারদের বয়স কুড়ি বাইশের নিচে নয়। সবার গোপ দাড়ি গজানো মুখ, পা ভর্তি লোম, দেখতেও ষন্ডার মত। খেলা শুরু হওয়ার আগে ওদের ক্যাপ্টেন এসে কানে কানে বলে গেলো, যদি বেকায়দায় বল মেরেছিস গোলে, তোদের মুন্ডু দিয়েই পরে ফুটবল খেলবো। শুনে আমার হাত পা ঠান্ডা।

ওদের পাশের গাঁয়ের লোকরা আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছিলো। টালিগঞ্জের ক্যাপ্টেন এসে বললো, সাপোর্টাররা কি রকম দেখছো তো। ঠিক মত গোল দিতে না পারলে আস্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে না।

খেলা শুরু হলো। গনু বললো, ঠিক মতো খেলে যা, খেলা শেষ করেই পালাবো। রাতে এখানে থাকবো না।

পালালাম ঠিকই, তবে খেলা শেষ হওয়ার আগেই। খেলতে নেমে ষণ্ডাগুলোর লাথি গুঁতো খেয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। আধ ঘন্টার ভেতর দুটো গোল দিয়ে দিলাম। তারপরই শুরু হলো মারপিট। দুই দলের সাপোর্টার, প্লেয়ার, রেফারি, কেউ বাদ নেই। যে যাকে হাতের কাছে পাচ্ছে পেটাচ্ছে, সবাই ছুটো ছুটি করছে, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি- এমন সময় হাত ধরে এক হ্যাচকা টান। গনু কললো, প্রাণে বাচঁতে

চাইলে এখনই পালা।

চোখের পলকে দুজন মাঠ থেকে হাওয়া। মাইল দুয়েকের মধ্যে একরকম দৌড়েই চলে এলাম। তারপর গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নি। ভাদ্র আশ্বিন মাস হবে। আকাশে মেঘ ছিলো। ঠান্ডা বাতাসে হাঁটতে ভালোই লাগছিলো। ওদিকে তখন বিকেলে পর বাস চলতো না। আমরা ঠিক করেছিলাম কয়েক মাইল পথ হেঁটেই মেরে দেবো।

হাঁটতে হাঁটতে যখন শ্মশান ঘাটের কাছে এলাম তখন সূর্য ডুবতে বসেছে। গনু বললো, চল জ্যাঠামশাইকে দেখে যাই। বাবা নেই বলে কাল আসার কথা মনেই ছিলো না।

গঙ্গার ধারে মস্ত বড় শ্মশান। ওদিকে তখন জনবসতি ছিলো না। রাস্তা থেকে বাঁ দিকে নামলে পুরোনো একটা আমবাগান। তার ভেতর এক পোড়ো মন্দিরে জ্যাঠামশাইর আস্তানা। গিয়ে দেখি তিনি মন্দিরের চাতালে বসে আছেন। ভীষণ গম্ভীর চেহারা। চুলগোঁপদাড়ি জঙ্গলের ভেতর টকটক লাল চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে। আমাদের দেখে ভীষণ চমকে উঠলেন। ধমক দিয়ে বললেন, অসময়ে কেন এসেছিস? সাহস তো কম নয়!

গলা তো নয় যেন বাজ পড়লো। গনু ঢোক গিলে বললো, কাল আসতে পারি নি তাই–

ওর কথা শেষ না হতেই আরেক ধমক – কাল আসতে পারিস নি বলে আজ আসবি? আজ যে অমাবশ্যা সে খেয়াল আছে? ওরা সব আজ আসবে। ভালো চাস তো এক্ষুনি চলে যা এখান থেকে।

কারা আসবে জিজ্ঞেস করার আর সাহস হল না। দুজন পা চালিয়ে চলে এলাম শ্মশান থেকে। গনু বেশ ভয় পেয়েছিলো। বললো, জ্যাঠামশাইকে আজ কেমন যেন লাগছিলো। কখনো এভাবে ধমক দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন নি।

আমারও খুব খারাপ লাগছিলো। সূর্য ডোবার সময়টাতে শ্মশানঘাট আর পোড়ো মন্দিরকে মনে হয়েছিলো এ পৃথিবীর বাইরের কোন জগৎ বুঝি। কেউ সেখানে ছিলো না, অথচ সারাক্ষণ মনে হচ্ছিলো কারা যেন আমাদের দেখছে।

হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেলো। আমাদের গলির মুখেই ছিলো হালদার বাড়ি। গনু বললো, আজ রাতটা আমার সঙ্গে থেকে যা। একা একা কেমন যেন ভয় করছে।

আকাশে তখন থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা গুমোট অন্ধকারে চারদিক থম থম করছে। পাড়ার কোন বাড়িতে আলো নেই। রাস্তার টিম টিমে গ্যাসের আলো থাকা না থাকা একই সমান। গনুর কথা শুনে ওর জন্য মায়া হলো। বললাম ঠিক আছে, থাকবো তোর সঙ্গে। বাড়িতে তো বলেই এসেছি রাতে ফিরবো না।

আমাদের পাড়ার সবচেয়ে বনেদি বাড়ি ছিলো গনুদের নিকুন্দ ভিলা। অনেক জায়গা জুড়ে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, হেন ফলের গাছ নেই যা ও বাড়িতে ছিলো না।

এত পুরোনো সব গাছ, দিনের বেলাতেই গা ছম ছম করতো একা ঢুকতে।

বাড়িতে ঢুকে গনু রাঁধুনে ঠাকুরকে ডেকে খাবার দিতে বললো। বুড়ো ঠাকুর থাকতো বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাঁচিলের ধারের একটা ঘরে। ও ছাড়া বাড়িতে সেদিন আর কেউ ছিল না।

খেয়ে উঠে সদর দরজা, ভেতর দরজা সব বন্ধ করে গনুর ঘরে ঢুকলাম। এমন সময় শুরু হলো প্রচন্ড ঝড়। খটাস খটাস করে জানালার কপাটগুলো বাড়ি খেতেই উঠে ওগুলো বন্ধ করে দিলাম। ঝড়ো বাতাসের শব্দ একটু কমলো। গনু বললো, ইস, এই ঝড় বাদলে জ্যাঠামশাই একা শ্মশানে পড়ে আছেন।

ওর কথা শুনে আমারও খারাপ লাগলো। তবু বললাম, বৃষ্টির সময় কেউ শ্মশানে যাবে না। তিনি নিশ্চয়ই মন্দিরেই থাকবেন।

গনু বললো, মন্দিরের যা অবস্থা, যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে।

কথা পাল্টাবার জন্য বললাম, ঘুম পাচ্ছে। চল শুড়ে পড়ি।

গনুর মস্ত পালঙ্কে পুরু জাজিম বিছানো। এক সঙ্গে চার জন শুতে পারবে। দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও একটু শীত শীত লাগছিলো। দুজন দুটো কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছি, ঘুম আসে না। ঝড় বাড়তেই লাগলো জানালায় বাতাসের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিলো, কেউ যেন জোরে জোরে ধাক্কা মারছে। বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছপালা ছিলো বলে ঝড়ের শব্দ বেশি মনে হচ্ছিলো। গোঁ গোঁা করে বুনো মোষের দল যেন সব লন্ড ভন্ড করে ছুটে যাচ্ছিলো।

সারা বিকেলের ধকলে ক্লান্ত ছিলাম বলে ঝড়ের দাপাদাপি শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাঝ রাতে ঘুম ভেড়ে গেলো। স্পষ্ট শুনলাম। কে যেন ডাকলো রাঙাদা দরজা খোল।

বাইরে তখনও ঝড়ের তান্ডব চলছে। বৃষ্টিও হচ্ছে। একটু পর আবার শুনলাম, গনু রাঙা, দরজা খোল।

গনু ধড়ফড় করে উঠে বসলো। বললো, বাইরে কেউ ডাকছে। তুই হারিকেনটা ধর।

গনুর শোবার ঘরের দরজাও বন্ধ ছিলো। ডাক শুনে মনে হলো সদর দরজার বাইরে থেকে কেউ ডাকছে।

পালঙ্কের তলায় হারিকেনটা ডীম করে রেখেছিলাম। গনুর কথা শুনে হারিকেন হাতে ওর পেছন পেছন গেলাম। দরজায় হাত দিতে যাবো এমন সময় বহু দূরে বাজ পড়ার মতো শব্দ হলো যেন, জ্যাঠামশাইর মেঘের মত গলা শুনলাম, গ-নু, সা-ব-ধা-ন। ঝড়ের বাতাসের ভেতর স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

হারিকেনটা আমি উচু করে তুলে ধরতে গিয়েছিলাম। জ্যাঠামশাইর গলা শুনে এমনই চমকে গেলাম- হাত থেকে হারিকেনটা পড়ে নিভে গেলো।

গনু দরজা খুলতে পারলো না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিস ফিস করে বললো,

জ্যাঠামশাইর গলা শুনেছিস তুই?

ঠিক তখনই আবার সদর দরজার বাইরে থেকে গনুর বাবার গলা শুনলাম- গনু দরজা খোল, আমরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো?

গনু হতভম্ভ হয়ে– বাবা ডাকছে, বলে আবার যেই দরজা খুলতে যাবে, তখই আবার জ্যাঠামশাইর গলা শোনা গেলো, গ-নু-সা-ব-ধা-ন। দ-র-জা- খু-ল-বি-না। ঘ-র থে-কে বে-রু বি-না।

এরপর এক বিরাট অমানুষিক আর্তনাদ শুনলাম। গনু অন্ধকারে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমিও ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। যত দোয়া দরুদ জানতাম সব পড়তে শুরু করলাম। আবার চিৎকার শুনলাম, মনে হলো কোন জন্তুর গলা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড শব্দে বাজ পড়লো। গনুদের গোটা বাড়ি থর থর করে কেঁপে উঠলো।

আমি গনুকে ধরে বিছানায় নিয়ে গেলাম। আমার ভেতরে কে যেন বললো, আজ রাতে ঘর থেকে বেরুবে না।

গনু আমার বুকের ভেতর ঠক ঠক করে কাঁপছিলো। ওকে কি বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎ ও– জ্যাঠামশাই বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভোর হলেই আমরা জ্যাঠামশাইকে দেখতে যাবো।

বাকি রাতটুকু আমরা দুজন জেগেই ছিলাম। শেষ রাতের দিকে ঝড় থেকে গেলো। ফজরের আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিলো জ্যাঠামশাইর কোন বিপদ হয়েছে। গনুকে নিয়ে বেরুলাম।

ঝড়ে গনুদের দুটো পুরোনো জাম গাছ ভেঙে পড়েছে। একটাকে মনে হলো ভীষণ শক্তিশালী কেউ যেন প্রচন্ড রাগে মাটি থেকে উপড়ে তুলে মাঝখানে ভেঙে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে। অবাক হয়ে গেলাম গনুদের বাড়ির বাইরে এসে। বাড়ির ভেতরের বাগান ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে, অথচ বাইরে ঝড়ের কোন চিহ্ন নেই। ভাঙা ডাল পালা দূরে থাক পাতাও খসে পড়ে নি কোথাও।

এ কেমন ঝড়! অজানা আশঙ্কায় বুকটা ঢিব ঢিব করতে লাগলো। রাস্তার দুপাশে কোথাও ঝড়ের কোন নাম গন্ধ নেই। শ্মশানের কাছে এলাম। আশে পাশে লোকালয় না থাকলেও শ্মশানঘাটে লোকজনের ভীড় দেখলাম। আবার আমাদের অবাক হবার পালা। শ্মশানের পাশে পুরনো আমবাগানটা প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে। ঠিক গনুদের বাড়ির মতো।

ভিড়ের কাছে যেতে কে যেন বললো, হালদার বাড়ির ছেলে এসেছে।

এক বুড়ো এসে গনুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, অঘোর বাবা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।

একজন ভিড় সরিয়ে আমাদের ভেতরে যেতে দিলো। দেখি মন্দিরের চাতালে জ্যাঠামশাইকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। একজন চাদর সরিয়ে দিলো। তাঁর সারা গা কাদা মাখা, চুল দাড়ি সব ভেজা।

লোকজন বলাবলি করছিলো, এ কেমন অদ্ভুত ঝড় কখনো দেখি নি। কোথাও

গাছের কুটোটি নড়লো না, অথচ এখানে সব একাকার হয়ে গেছে। একজন বললো, মাঝ রাতে অঘোর বাবার গলা শুনেই বুঝেছি ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে। বহু বছর আগে এরকমটি শুনেছিলাম।

গনু আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে জ্যাঠামশাই মরে গেলেন।

অন্যরা কেউ ওর কথা বুঝলো না। ভাবলো শোকে ওর মাথা ঠিক নেই। আমি ছাড়া আর কেউ জানলো না গনুর কথায় এতটুকু মিথ্যা ছিলো না। সেই রাতে আমাদের খারাপ নিশি ডেকেছিলো। বেরুলে নির্ঘাত মারা পড়তাম। জ্যাঠামশাই বাধা দিয়েছিলেন বলেই ওঁর ওপর রাগ হয়েছিলো। গনুকে সাবধান করতে গিয়ে নিজে বোধ হয় অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন। যে জন্যে ওকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হলো। অবশ্য এসব মানুষের মৃত্যু এভাবেই হয়।

এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শামুদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ভয় না পাওয়া বীর পুরুষেরা একে অপরের গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে ভয়ে সিটিয়ে আছে।

দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না

বাংলাপিডিএফ এ আপলোডকৃত বইসমূহ আপনার নিজের ওয়েবসাইট/ব্লগ/সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সময় দয়া করে অরিজিনাল আপলোডারদের ক্রেডিট দিন। দিনে দিনে পিডিএফ বইয়ের সংখ্যা যে কমে আসছে তার অন্যতম প্রধাণ কারন অবাধে এক ওয়েবসাইটের বই অন্য ওয়েবসাইটে কোন প্রকার মেনশন করা ছাড়াই শেয়ার করা। এর মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আরেকজনের আপলোড করা বই ওয়াটারমার্ক লাগিয়ে নিজের বলেও চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাপিডিএফ থেকেও অনেক আপলোডার হারিয়ে গেছেন শুধুমাত্র এইসব পিডিএফ চুরির কারনে। অল্প গুটিকয়েক যেসব আপলোডার আছেন, তাদেরও অনেকে নিয়মিত পিডিএফ আপলোডে উৎসাহ পান না। কাজেই তাদের ধরে রাখার দায়িত্তটা আপনাদের পাঠকদের নিতে হবে। আমাদের বই শেয়ার করেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দয়া করে ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করে করুন। এতে আপনাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর কিন্তু কমে যাবে না, উলটো সবাই আপনাদের সততার প্রশংসাই করবে। পিডিএফ কমিউনিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না।

বাংলাপিডিএফ এ ডোনেট করতে চাইলে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে পেপালের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর বিকাশ নাম্বার প্রয়োজন হলে মেইল করুনঃ banglapdf@yahoo.com এই ঠিকানায়!

ধন্যবাদ সবাইকে।

Banglapdf.net

নিশাচরের বাড়ি

ভয় পেতে যে মজা লাগে, রাঙাদাদুর গল্প না শুনলে শামুরা কোন দিন বুঝতে পারতো না। নিশির গল্প শোনার পরদিন সকালে ওরা জানতে পারলো মাঝ রাতে ছোটন নিশির ডাক শুনেছে। রাতের আসরে এ কথা রাঙাদাদুর কানে যেতেই তিনি দোয়া পড়ে ওর বুকে ফুঁ দিলেন। বললেন, খবরদার রাতে কেউ চার বার ডাক না ডাকলে দরজা খুলবি না।

শামু বললো, তুমি যে বলো, আমাদের পীরের বংশ, ওরা কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না?

রাঙাদাদু কাষ্ঠ হাসলেন পীর ছিলেন আমাদের দাদা পরদাদারা। ওঁদের দোয়া আছে বলেই এই আমি এখনও এত কিছুর পাল্লায় পড়েও বেঁচে আছি। তোরাও যেমন যখের বাড়িতে দিব্যি আছিস। মুরুব্বির দোয়া না থাকলে এমন হয় না। তবে দিন যত যাবে দোয়ার জোর তত কমবে। তোরা তো আর সে সব আমল করিস না। বুঝি না তোদের বাপ চাচারা কি শিক্ষা দিয়েছে তোদের!

ছোটনকে নিশি ডেকেছিলো বলে সারাদিন ভারি ডাঁট নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বললো, আর কিসের পাল্লায় পড়েছিলে রাঙাদাদু তাই বলো না?

আলাবোলার নল ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে গুড়র গুড়র শব্দ করতে করতে রাঙাদাদু বললেন, কত কিছুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বলে শেষ করা যাবে!

কেন যাবে না?

একটা একটা করে বলোই না।

সবটুকু বলতে হবে। ছোটরা সবাই আবার হই চই শুরু করে দিলো।

শোন তাহলে। একটু নড়ে চড়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম করে বসলেন রাঙাদাদু। আমি তখন বড়দার খড়মপেটা খেয়ে বাড়ির পাট মিটিয়ে দিয়েছি। কয়েক বছর বন বিভাগে চাকরি করে সেটাও ছেড়ে দিলাম। কিছু একটা তো করে খেতে হবে, ঢুকলাম এক ওষুধ কোম্পনিতে। ওদেরই কাজে সেবার আমাকে সুন্দর বনের কাছাকাছি এক জায়গায় যেতে হয়েছিলো। জায়গাটা খুলনা থেকে ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। কোন রকমে চলার মতো রাস্তা রয়েছে। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে সে রাস্তায়

কোন মেরামতের ছাপ পড়ে নি, এটা যে কেউ দেখে বলে দিতে পারবে।

ভাগ্যিস জীপে যাচ্ছিলাম। অন্য কোন গাড়ি হলে সামালানো কষ্ট হতো। নিজেই চালাচ্ছিলাম। সঙ্গে আর কেউ ছিলো না। ঝাঁকুনির ভয়ে খুব আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছিলো।

ভাঙা রাস্তার জন্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দায়ী করলে একটু অবিচার হবে। রাস্তার দু'পাশে জনমানুষের বিশেষ সাড়া শব্দ নেই। তখন পৌষের শেষ বিকেল। কদাচিৎ পথে খড়ের বোঝা মাথায় দু' একটা লোক চোখে পড়ছিলো। ঘর-বাড়িও দূরে দূরে। পুরো অঞ্চলটাকে কেমন পরিত্যাক্ত বলে মনে হচ্ছিলো। দেখে মনে হলো বহুদিন আগে হয়তো এখানে লোকজনের আনাগোনা ছিলো, বসতি ছিলো। হয়তো কোন কারণে জায়গা এমন বিরানা হয়ে গেছে।

যাচ্ছিলাম ঐক হাটে। সেখানে একজন ডাক্তারকে কিছু ওষুধের প্যাকেট দিয়ে আসতে হবে। রাতটা তাঁর ওখানে কাটিয়ে সকালের দিকে ফিরে আসবো– আমার ওপর মোটামুটি এরকম নির্দেশ দেয়া ছিলো। ভাবলাম ডাক্তারের কাছেই শোনা যাবে জায়গাটার এ দৈন্যদশা কেন।

বাইরে কোথাও খাবার অভ্যেস আমার তখনও হয় নি। সে জন্যে ছোট্ট একটা টিফিন ক্যারিয়ারে রাতের জন্য কিছু খাবার নিয়েছিলাম।

কতটুকু পথ পেরিয়েছি ঠিক কলতে পারবো না। মাইল মিটার দেখে উঠলেও কোন লাভ হলো না। আমার নড়বড়ে জিপটির স্পীডের কাঁটা, মাইলের ঘর, সব কিছু যেন পৌষের কনকনে হাওয়ায় জমে গিয়েছিলো। কোনটাই কোন কাজ করছিলো না। তাতে মাথা ব্যাথার কোন কারণ ছিলো না। ব্রেকও ভালো কাজ করছিলো না। তাতেও ভয় পাবার কোন কারণ ছিলো না। কারণ আমি যথেষ্ট আস্তে আস্তে চালাচ্ছিলাম তো বটেই, তাছাড়া পথে মানুষ দূরে থাক কুকুর বেড়ালও চোখে পড়ছিলো না। মোদ্দা কথা কোন রকম বিপদেরই সম্ভাবনা ছিলো না। আপন মনে এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, গাইতে গাইতে দিব্যি খোশ মেজাজেই যাচ্ছিলাম। অবশ্য আকাশ থেকে সূর্য তখনও বিদায় নেয় নি। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু বিপদ বাধলো তখনই যখন ঘং ঘং ঘোয়াং একটা বিদঘুটে শব্দ করে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেলো। বার বার ষ্টার্ট নিতে গিয়েও কোন ফল হলো না। ফুয়েল ঠিকই আছে। নেমে বনেট খুলে দেখলাম ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে। যার সাধারণ অর্থ হলো ধাক্কা না লাগালে ইঞ্জিন আর কথা কইবে না।

অন্ধকার না হতেই চোখে অন্ধকার দেখলাম। রাস্তার যে অবস্থা নিজে সুইচ অন করে ধাক্কা দেয়া যে একেবারেই অসম্ভব– এ কথা ভাবতে আমার গা হিম হয়ে গেলো। আমি কেন, আমার তিন গুণ বেশি জোরালো কেউ যদি থাকতো, সেও যে কিছু করতে পারতো না, এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি।

ডিটেকটিভ বইয়ে পড়েছি মরিয়া হয়ে মানুষ নাকি অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। কয়েকবার চেষ্টা চালালাম। গাড়ি একচুলও নড়লো না বরং আমিই পা হড়কে

মাটির সাথে বুক মেলালাম। মনে হলো বইয়ে এমন মিছে কথাও লেখে! সেই লেখকগুলোকে পেলে তখন আমার গাড়ি ঠেলতে লাগিয়ে দিয়ে বাহাদুরি দেখতাম। অবশ্য সবাইকে একসঙ্গে নয়। এক এক করে।

আগেই বলেছি জায়গাটার গা ঘেঁসে রয়েছে সুন্দরবন। রাতের বেলায় একটা রয়েল বেঙ্গলের সাথে যে মোলাকাত হবে না, একথা জোর গলায় কেউ বলতে পারবে না। যারা সুন্দরবনের কাছাকাছি থাকে তারা জানে পৌষের এক পহর রাতেই বাঘেরা বন থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোকের মতো ঘোরাঘুরি করে! আর সুযোগ মতো একজনকে পেলেই দিব্যি ঘাড় মটকে বনের ভেতর সটকে পড়ে।

পাশের ক্ষেতে ধান কাটা হয়ে গেছে। পোড়ো জমি খাঁ খাঁ করছিলো। সে মুহূর্তে আমার মনে হলো শূন্য জমিটায় যেন প্রচুর সরষে ফুল ফুটে আছে। কেমন যেন সবুজ, হলুদ। ভয়ে আমি দিশেহারা হয়ে উঠলাম।

আন্দাজের ওপর হিসেব করলাম আমাকে আরো মাইল ছয়েক পথ পার হতে হবে– যদি হাটে যাবার কোন ইচ্ছে থাকে। অবশ্য বাঘের পেটে যাবার ইচ্ছে হলে এক গজ হাঁটার কষ্ট স্বীকার করারও কোন মানে হয় না। গন্ধে গন্ধে তারা ঠিকই খুঁজে বের করে নেবে। মানুষ চিনতে মানুষের ভুল হয় শুনেছি, কিন্তু বাঘের ভুল হয়েছে এরকম কথা আমি কখনো শুনি নি।

বাঘের পেটে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিলো না। তবু হেঁটে যেতে পথেই ভুল করে বাঘের পেটে যে যাবো না এ নিরাপত্তা মানুষ দূরে থাক খোদ বাঘও দিতে পারতো না। এ নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানোও নিরাপদ নয়। পৌষের সন্ধ্যার নরম সূর্যটা ডুবতে ডুবতে আমার অবস্থার কথা ভেবে হয়তো আফশোস করছিলো। তবে রসিকতা করার জন্যে অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন যে বেশি তাড়াতাড়ি ডুবছিলো এতে কোন সন্দেহ রইলো না।

আসন্ন রাতের সম্ভাব্য কিছু ঘটনার কথা মনে হতেই আমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলাম। বাঘ ছাড়া চোর ডাকাতের কথাও মনে হলো। সুন্দরবন অঞ্চলটায় চোর ডাকাতের খ্যাতি যথেষ্ট। কেউ কম ভয়াবহ নয়। রাতের আগেই আমাকে একটা আস্তানা খুঁজে বের করতেই হবে।

চারপাশে তাকালাম। চিৎকার করলাম। চমৎকার প্রতিধ্বনি হলো। কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। অবাক হলাম। সন্ধ্যের সময়– অথচ একটা পাখির ডাকও শুনতে পেলাম না!

চারপাশে তাকিয়ে আবার চিৎকার করলাম, 'কেউ আছো এখানে?'

প্রতিধ্বনি হলো এখানে------- এখানে-------- এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে আমি ভীষণ রকম চমকে উঠলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যটা হারিয়ে গেলো। পাগলের মত ওখানে সেখানে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। কোথাও যদি মানুষের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়। পশ্চিমে বেশ দূরে একটা টিলার মতো দেখতে পেলাম। হঠাৎ দেখি সেখানে একজন মানুষ বসে

আছে। চমকানোর কারণ এখানে এ টিলা আর মানুষটিকে আগে লক্ষ্য করি নি।

মানুষটি কে, আগে কোথায় ছিলো, এ সব কথা না ভেবেই ছুটলাম, টিলার দিকে। মানুষের সঙ্গ লাভই ছিলো তখন আমার কাছে সবচেয়ে বেশি জরুরি। সূর্য নেই। টিলার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে আলোর শেষ রেশটুকুও আকাশ থেকে মুছে গেলো। একটা ফিকে কুয়াশা ভেজা অন্ধকার নামতে লাগলো চারপাশে।

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মানুষটির কাছে এসে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে দেখি একজন মহিলা। ভদ্রমহিলাই বলা উচিৎ। মাথায় কাপড় দেয়া। তখনো তিনি আমার দিকে তাকান নি। হয়তো লক্ষ্য করেন নি। পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে ছিলেন পাথরের মূর্তির মতো।

দম নিয়ে বললাম আপনার বাড়িতে রাত কাটানোর একটু আশ্রয় পাবো কি? আমি হাটে–

'না'। আমাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে কর্কশ স্বরে বললেন ভদ্রমহিলা। যেন তিনি এ কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন। – আমার বাড়িতে অসুবিধা আছে। বলেই ঘুরে তাকালেন। আমি একটু চমকে উঠলাম। ভদ্রমহিলার মুখটা আগুনে পুড়ে বিচ্ছিরিভাবে ঝলসে গেছে। একটা চোখ নেই। অপর চোখটি –সেই সন্ধ্যে আলোতে দেখলাম ভয়ানক রক্তাক্ত আর বীভৎস রকম বাইরে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আশ্রয় যে ভাবেই হোক পেতে হবে। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বললাম, বড় বিপদে পড়েছি মা! হাটে যাবার কোন পথই দেখছি না। গাড়িটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে। দয়া করে আমাকে আপনার ছেলের মতো ভাবুন।

ভদ্র মহিলা ফিশ ফিশ করে বললেন, ছেলে!

ভয়ে আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম– ছেলেই মনে করুন মা। আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি আপনারই মতো হতেন। তিনি বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন মা! মা!

কি যেন ভাবলেন তিনি। আবার ঘুরে পশ্চিমের আকাশে তাকালেন। খুব আস্তে করে বললেন, বাড়িতে আমি একা থাকি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমার জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না মা।

তিনি তেমনি আস্তে বললেন, আমার সে ক্ষমতাও নেই। তারপর ঘুরে বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

কথা না বলে তাকে অনুসরণ করলাম। প্রচুর গাছ। অনেক বছরের পুরোনো শাল আর দেবদারু। রীতিমতো ঠাস বুনোট। এরই জন্যে গাছের ভেতরের মস্তো দোতলা বাড়িটা আগে চোখে পড়ে নি।

বহু বছরের ঝড়-ঝাপটা এ বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। দরজা জানালা ভাঙা, কোথাও একেবারেই নেই। পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে এসেছে। সারা দেয়ালে অশথ আর বটের চারা স্বচ্ছন্দে শেকড় মেলে দিয়েছে। অনেকটা

পোড়ো বাড়ির মতো মনে হলো।

অনেকগুলো প্রশ্ন মনে ভিড় জমালো। এই বিরান জায়গায় কেন বাড়িটা? ভদ্রমহিলা কেন একা থাকেন? একা তাঁর চলে কি করে? এমনি তরো অনেক প্রশ্ন। কিন্তু সব আমাকে চেপে যেতে হলো।

ভদ্রমহিলা বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই চৌকাঠ ধরে থমকে দাঁড়ালেন। বিস্মিত হয়ে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। তিনি পেছনে না তাকিয়েই বললেন, দেখো তোমাকে একটা কথা বলবো। তোমার ভালোর জন্যই বলছি। আমার বাড়িতে অনেক কিছুই তুমি দেখতে পাবে, যাতে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। আমি চাই না তুমি কোন প্রশ্ন করে আমাকে বিরক্ত করো। সব কিছু সহজভাবে নিতে চেষ্টা করো। বলেই তিনি ভেতরে ঢুকলেন। আমি আবার তাঁকে অনুসরণ করলাম।

তখন আমার ভয় হলো। চোর- ডাকাতের হাতে পড়ি নি তো? বলা যায় না। হয় তো এসে আড্ডা চিনে গেছি বলে আমাকে এভাবে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু তাও হচ্ছে কোথায়? আমি নিজেই যে জোর করে এসেছি! হতেও পারে। হয়তো ভদ্র মহিলা ভালো বলেই আমাকে আসতে বারণ করেছিলেন। তাহলে আমি যেচেই ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছি! ভেবে কোন কুল কিনারা পেলাম না।

জীবনে বহুবার বিপদে পড়েছি। বহু অভিজ্ঞতাও হয়েছে। যার জন্যে বহু বিপদের হাত থেকে অভাবনীয় উপায়ে রক্ষাও পেয়েছি। আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হচ্ছে– বিপদে কখনো উত্তেজিত হয়ে মাথাগরম না করা। যতক্ষণ তুমি ঠান্ডা মাথায় থাকবে, ততক্ষণ বিপদের হাতে থেকে উদ্ধার পাবার কথা ভাবতে পারবে। কিন্তু যেই তুমি উত্তেজিত হয়েছো, তখন আর রক্ষা নেই। সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে, অনেক সহজ পথও তুমি ভুলে যাবে। আর কক্ষনো হাল ছাড়তে নেই। তোমার নিঃশ্বাস যতক্ষণ বইছে ততক্ষণ তুমি বাঁচার আশা করতে পারো। বুদ্ধিটাকে যতো পারো খেলাতে চেষ্টা করবে।

আমি ঠিক করে ফেললাম একেবারে বেঘোরে মরা অসম্ভব। আমাকে তৈরি থাকতে হবে। পালানোর চেষ্টা করা উচিত হবে না। আমার কাছে এ যায়গার কোন ঠিকানাই জানা নেই, কিন্তু ডাকাতের সব নখদর্পনে থাকার কথা। যে মুহূর্তে তারা খবর পাবে আমি পালিয়েছি, তখনই সতর্ক হয়ে যাবে। তখন কেন জানি না আমার মনে হচ্ছিলো এ ভদ্রমহিলা আমার কোন ক্ষতি হতে দেবে না। তাঁর কথা মত চলাটাই সবচেয়ে বেশি উচিত হবে।

অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে একটা ঘরে এসে তিনি বললেন, তুমি এ ঘরে থাকতে পারো। চাদরটা ঝেড়ে ফেলো। আমি একটা কম্বল এনে দিচ্ছি।

ঘরটা প্রকাণ্ড। আসবাবপত্র খুব বেশি ঠাহর হলো না। তাঁকে বললাম, আমার খাবারগুলো গাড়িতে রয়ে গেছে। আপনি যদি বলেন তাহলে নিয়ে আসি। রাত বেশি হলে অসুবিধে হতে পারে।

তিনি একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন– আগে কেন আনো নি? এক্ষুনি যাও ছুটে যাবে

আর আসবে। আমি দরজায় দাঁড়াচ্ছি।

আমি ছুটলাম। এক দৌড়ে রাস্তায় গাড়িটার কাছে এলাম। টিফিন ক্যারিয়ারটা নিলাম। একটা টর্চ নিলাম। আর কি মনে হতে হতে হাত দেড়েক লম্বা লোহার স্ক্রু ড্রাইভারটাও কোমরে গুঁজে নিলাম।

ভদ্রমহিলা রাত হবার কথায় কেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন ঠিক বুজে উঠতে পারছিলাম না। শুধু মনে হলো তিনি সত্যিই আমার ভালো চান।

টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আসছিলাম। তিনি দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি আসতেই খুব শান্ত অথচ কঠিন গলায় আস্তে আস্তে বললেন, আমার এখানে টর্চ জ্বালাতে পারবে না। আমি আলো সইতে পারি না।

থতমত খেয়ে বললাম, তাই হবে মা।

তিনি এবার নরম স্বরে বললেন, ঘরের দরজা ভালো ভাবে বন্ধ করবে। খাবার খেয়েই শুয়ে পড়ো।

মাথা নেড়ে ঘরে ঢুকলাম। তিনি চলে গেলেন। টুপ করে একবার টর্চটা জ্বালালাম। উচুঁ পুরোনো আমলের খাট। চাদরটা টান করে বিছানো। একটা কম্বল ভাঁজ করা। লক্ষ্য করলাম চাদর এবং কম্বলের দুটোরই এক কোণের কাছে বেশ কিছুটা জায়গা পুড়ে গেছে। ঘরের একদিকে সেকেলে নকশা আঁকা বিরাট ড্রেসিং টেবিল। আর একদিকে একটা সিন্দুক। প্রায় পুরো একটা দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা। ঘরের দেয়ালের বেশির ভাগ পলেস্তারা খসে পড়েছে। আগুনের ধোঁয়ার কালচে দাগ এখানে সেখানে।

সিন্দুকের উপর টিফিন ক্যারিয়ারটা রাখলাম। এক এক করে তিনটে বাটি খুললাম। পরোটা, ভাজি, ডিম আর পুডিং। বসতেই পানির কথা মনে হলো। টর্চ জ্বেলে ঘরের চারপাশে পানির কোন রকম ব্যবস্থা দেখতে পেলাম না। অবশ্য এখানে পানি না থাকা খুবই স্বাভাবিক বরং থাকলে সেটা অস্বাভাবিক হতো। কিন্তু পানি না হলে যে একেবারেই চলবে না।

বাড়ীর ধারে কাছে টিউব অয়েল কিম্বা কুয়ো নিশ্চয়ই আছে– এই ভেবে টর্চ আর টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ বেশি জ্বালাতে সাহস হচ্ছিলো না। কখন সেই ভদ্র মহিলা দেখে বিরক্ত হন। ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলা পেছন থেকে ডাকলেন– দাঁড়াও! কোথায় যাচ্ছো?

টর্চ নিভিয়ে বললাম– পানির জন্যে যাচ্ছি।

কোথায় পানি? কর্কশ গলায় আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

আমতা আমতা করে বললাম, এদিকে কোন টিউব অয়েল কি–

কে বললে এদিকে পানি পাওয়া যাবে। ভদ্রমহিলার গলার স্বর আরো কর্কশ হয়ে উঠলো–ঘরে যাও! রাতে ঘর থেকে কোথাও বেরুবে না।

অপরাধীর মতো ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম, ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। ঘরে ঢুকতে হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হলো। টর্চের আলো ফেললাম, কেউ কোথাও নেই। মনে হলো ভুল শুনছি না তো! বুকটা একটু কেঁপে উঠলো। ভুল কেন শুনবো? আমার

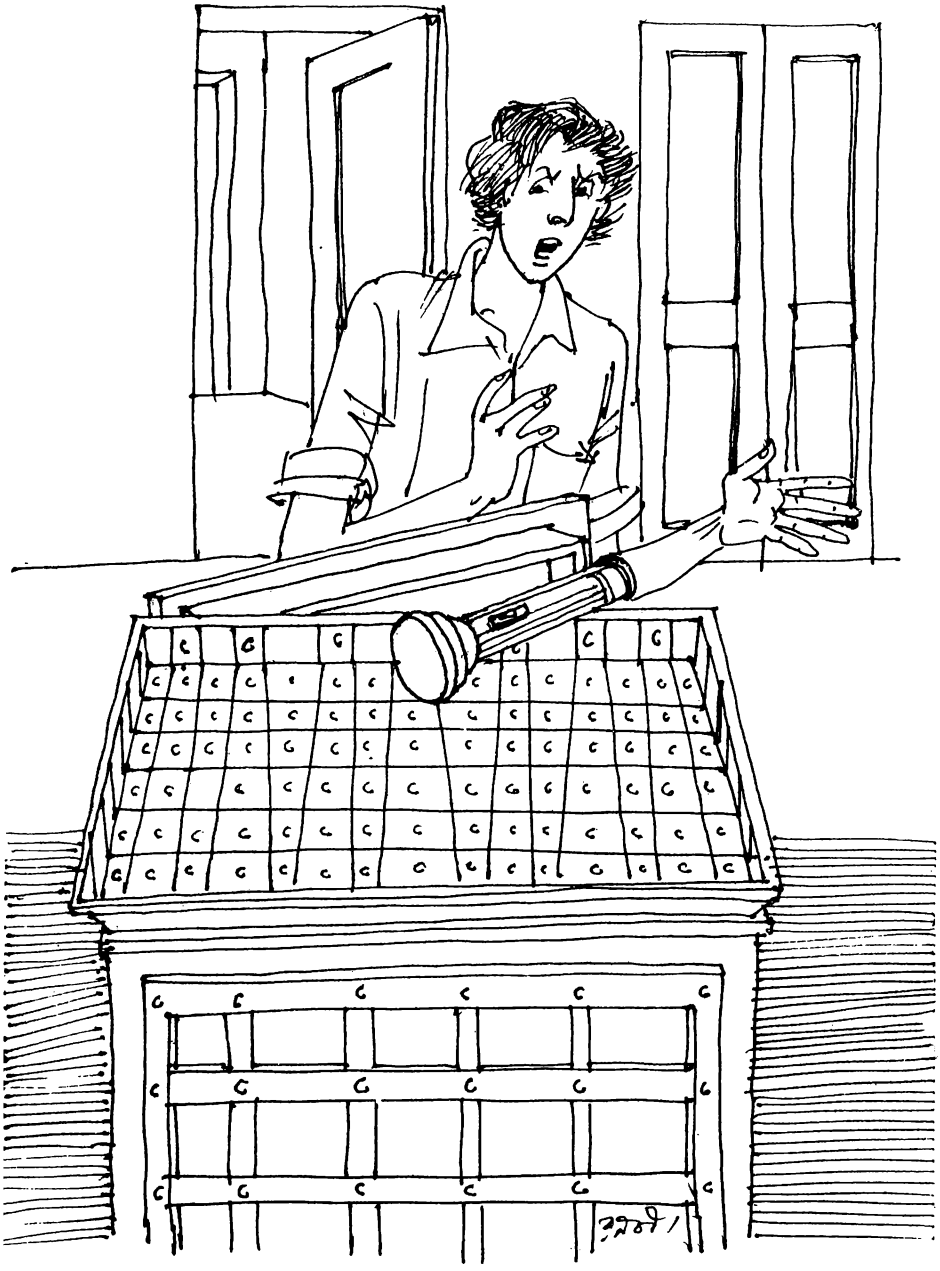

সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এলো

মাথা কি ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না? কিন্তু মাথা গরম করলে একটা অঘটন ঘটবে এ রকম একটা ধারণা আমার এ বাড়িতে পা দেবার পর পরই জন্মেছিলো। সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

সামান্য কিছু খেয়ে শুড়ে পড়া দরকার। এই ভেবে সিন্দুকটার কাছে এলাম। টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলাম।

একি! টিফিন ক্যারিয়ারের খাবারগুলো কোথায়? একটু আগে যেখানে দুটো পরোটা, দুটো ডিমের মামলেট, ফুলকপি আর আলু ভাজি ছিলো– কিছুই নেই শুধু পুডিং টুকু অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

কে এলো ঘরে? ভদ্রমহিলা ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। তবে কি তিনি? তাঁর সঙ্গে তো দেখাই হলো। এতো কম সময়ে তাঁর পক্ষে খাবারগুলো সরানো সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি এ রসিকতা কেন করবেন? আবার মনে হলো, হয় তো বাড়িতে লোকজন নেই। খাবার কিছু নেই। বাইরের লোকের কাছে চাওয়াটা লজ্জার কাজ মনে করে, তার চেয়েও বেশি লজ্জার কাজ আমার অগোচরে তাঁকে করতে হয়েছে।

প্রত্যেকটা প্রশ্নের একটা জবাব খুঁজে নিচ্ছিলাম। পুডিংটুকু খেয়ে এ নিয়ে হয়তো আর মাথাও ঘামাতাম না। কিন্তু পুডিং খেয়ে সিন্দুকটার ওপর থেকে যখন উঠেছি তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। যার কথা মনে হলে আজও বুক কেঁপে ওঠে।

টর্চটা খাবার সময় জ্বেলেই রেখেছিলাম। বসেছিলাম সিন্দুকের ওপরে। খাবার শেষ হলে মনে হলো সিন্দুকের ভেতর থেকে কে যেন ওপরের দিকে চাপ দিচ্ছে। নামতেই সিন্দুকের ডালাটা সামান্য ফাঁক হলো। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এলো। টর্চের আলোতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার টিফিন ক্যারিয়ারের পরোটা যার কিছুটা অংশ তখন সিন্দুকের ভেতরে আর বাকিটা বাইরে – ধীরে ধীরে সিন্দুকের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভারি ডালাটা পড়ে গেলো।

পাগলের মতো সিন্দুকের ডালাটা প্রাণপণে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। হাত লাগানোর পর মুহূর্তেই মনে হলো এ অসাধ্য সাধন আমার মতো দশজনের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক আর ভৌতিক বলে মনো হলো। এ বাড়িটা মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে –অন্য কোন অশুভ শক্তির প্রভাবে রয়েছে। সমস্ত কিছু অশরীরী কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মানুষের কোন ক্ষমতা এখানে কাজে লাগবে না। আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো- পালাও! আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা উচিত হবে না।

টর্চ জ্বালবো না। মহিলাটি টের পেয়ে যেতে পারেন। আস্তে আস্তে পা টিপে দরজার কাছে এলাম। খুট করে ছিটকিনিটা নামিয়ে দরজাটা ফাঁক করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। দরজার সামনে সেই মহিলাট দাঁড়িয়ে। বারান্দার ওপাশ থেকে আসা চাঁদের আলোয় মহিলাকে ভয়ানক মনে হলো। চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম– কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম––চলে যাবো। এখানে থাকা

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি আমাকে যেতে দিন।

আমার গলার স্বর কাঁপছিলো। পুরো শরীরটা কাঁপছিলো।

মহিলার পেছন থেকে ভারি ফ্যাশফেশে গলায় কে যেন বললো এখান থেকে কেউ জীবিত ফিরে যেতে পারে না।

লম্বায় সাড়ে ছ' ফুটের মতো, গায়ে ভারি আলখাল্লা, একজন পুরুষ সামনে এগিয়ে এলো।

মহিলাটি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। পুরুষটিকে হাত দিয়ে সরিয়ে কঠিন স্বরে বললেন– না। এর কোন ক্ষতি তুমি করতে পারবে না।

পুরুষটি ধাক্কা মেরে মহিলাকে মাটিতে ফেলে দিলো– সরো। পথ ছাড়ো। ওদের জন্য অনেক রক্ত লাগবে। মানুষের তাজা রক্ত। এভাবে একে ছেড়ে দিতে পারি না।

আমি শুধু অনুভব করছি, এখনো জ্ঞান হারাই নি। এক পা দু' পা পিছিয়ে গেলাম। লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। আমি আরো পিছিয়ে গেলাম। ছুটে যাবার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি। লোকটি আমার অক্ষমতার কথা জেনেই আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। আমি আরো পিছিয়ে গেলাম,। পু দু'টো অসম্ভব ভারি হয়ে এসেছে। পেছনে দেয়ালের সঙ্গে আমার পিঠ ঠেকলো। আর যাবার পথ নেই। লোকটা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে, হাত দুটো সামনে মেলে ধরে।

আর দু'পা এগিয়ে এসে লোকটা আমার গলা টিপে ধরবে। দেখেই মনে হয় অসুরের শক্তি রয়েছে ওর গায়। তখনই আমার মনে হলো, আমি এখনো বেঁচে আছি। আমাকে বাঁচতে হবে। শরীরে শক্তি ফিরে পেলাম। কোমরের বেল্টে গোঁজা স্ক্রু ড্রাইভারটার কথা মনে হলো।

আর এক পা!

বাঁ হাতে টর্চটা লোকটার ঠিক মুখের উপর জ্বেলে ধরে ডান হাতে বিদ্যুৎ বেগে স্ক্রু ড্রাইভারটা ওর চোখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম।

একটা মরণ চিৎকার করে লোকটা দু' হাতে মুখ ঢাকলো। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম।

আমি ছুটছিলাম। পেছনে ভারি পায়ের শব্দ। টর্চটা জ্বেলে আমি প্রাণপনে ছুটছি। পায়ের শব্দ ক্রমশঃ কাছে আসছে। আমি দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছি। যে ভাবেই হোক এ পিশাচপুরি থেকে আমাকে পালাতে হবে। রাস্তায় উঠে ছুটছি সামনের দিকে।

সে রাতে এক রকম ছুটতে ছুটতেই ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারাই।

পরে আমার মুখে সব কথা শুনে ডাক্তার এক মিনিট থ' মেরে বসে রইলেন। তারপর বললেন–আপনি বেঁচে আছেন তাহলে!

আমি বললাম, বেঁচে আছি, দেখতেই পাচ্ছেন। ও বাড়িতে ওরা কারা?

ডাক্তার একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, ওরা কোন জীবিত মানুষ নয়, আবার মৃতও নয়। বহুকাল আগে ওটা ছিলো এক অত্যাচারী জমিদারের বাড়ি। ভয়ানক অত্যাচারী ছিলো জমিদার। অনেকে মারবার চেষ্টা করেছিলো, পারে নি। জমিদার ছিলো পিশাচসিদ্ধ। একদিন গ্রামের সমস্ত প্রজা ক্ষেপে গিয়ে জমিদারের বাড়ি আগুন ধরিয়ে দেয়। বাড়ির সবাই পুড়ে মরে। পরে লোকেরা দেখলো পিশাচরা মরে নি। মানুষের রক্ত খেয়ে ওরা বেঁচে রয়েছে। শেষে আস্তে আস্তে এক সময় পুরো গ্রামটাই বিরান হয়ে গেলো।

রাঙাদাদুর গল্প শেষ হতেই বড় বিবিদাদু এস তাড়া লাগালেন, তোদের খাবার নিয়ে বৌমারা কতক্ষণ বসে থাকবে? শিগগির নিচে গিয়ে খেয়ে আয়।

রামু ফিশ ফিশ করে শামুর কাছে জানতে চাইলো, পিশাচরা কি ডিম পরোটা খায় দাদা?

শামু চাপা গলায় ধমক দিলো, চুপ কর হাঁদা, রাঙাদাদুর কানে গেলে আর গল্প শুনতে হবে না।

শিরোলের শয়তান

বড় জেঠিমার নকামকী এসেছেন বেড়াতে। রাঙাদাদুর গল্প শুনে একদিন বড় বিবিদাদুকে বললেন, এ তো ভালো কথা নয় বেয়ান। এমনি তো ফাঁসুড়ের বাড়িতে উঠেছেন। কত লোক অপঘাতে মরেছে এ বাড়িতে। তার ওপর রোজ রাত্তিরে আসর জমিয়ে তেনাদের নাম নেয়া, আমার মোটেই ভালো লাগছে না। রাঙা বেয়ানের হাবভাবও আমার ভালো মনে হচ্ছে না।

বড় বিবিদাদু কাষ্ঠ হেসে বললেন, ছোঁড়ারা মজা পায়, তাই ওসব বলে। আমি বারণ করে দেবো।

এরপর বড় বিবিদাদু রাঙাদাদুকে আড়ালে ডেকে বললেন, উল্টোডাঙ্গার বেয়ান যদ্দিন এ বাড়িতে আছেন, তুমি বাপু ভূতের গল্পো শুনিয়ো না। বেয়ানের ভারি ভূতের ভয়।

শুনে রাঙাদাদু মুখ টিপ হাসলেন। সেদিন রাতের আসরে বললেন, ভূত যে বানানো যায় তা জানিস?

শামু উত্তেজিত হয়ে বললো, কি ভাবে রাঙা দাদু?

সেবার নেহাত কাজের খাতিরেই আমাকে শিরোল যেতে হয়েছিলো, অ্যাডভেঞ্চার করতে নয়। তবে হ্যাঁ, জায়গাটা সম্পর্কে যাবার আগে নানান কথা শুনে একটু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ যে একেবারেই পাই নি তাও নয়। ব্যাপারটা খুলেই বলি। এই বলে রঙাদাদু আলবোলার নলে কয়েকবার টান দিয়ে জাফরানের গন্ধমাখা ধোঁয়া ছড়ালেন চারপাশে।

শিরোল গ্রামটা হাওয়াতেই পড়েছে। রূপনারাণের ধারে। বাকশীর হাট থেকে ক্রোশ দুইয়ের পথ। মামা বললেন, তাঁর কাজেই যাচ্ছিলাম– পারবি তো যেতে? হাঁটতে হবে কিন্তু চার মাইল। লঞ্চেই যাস আর ষ্টীমারেই যাস–সব কিন্তু ওই বাকশীর হাট পর্যন্ত। তারপর হাঁটা, ঝাড়া চার মাইল।

হোক না চার মাইল–তাতে কি? এইতো সেবার– বলেই ফিরিস্তি দিতে বসলাম কবে কোথায় এক নাগাড়ে ক'মাইল হেঁটেছিলাম। তখন মাত্র এন্ট্রাস পাশ করেছি।

নিজের বাহাদুরী জাহির করতে আমি মোটেই পেছপা নই।

মামা বললেন, বেশ, তা যাবি যখন তখন তোকে খুলেই বলি। মামা একটু থামলেন, আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ভালো করে। এক নজরে ভেতর– বার সব জরিপ করে নিলেন। দেখলেন– না, বলা চলে ছোঁড়াকে। সামলাতে পারবে। বললেন, তা যাওয়ার আগে একটু ভেবে দেখ বাপু। জায়গাটা সম্পর্কে একটু খারাপ কথা শোনা যায়। আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম – কি রকম?

এই ধর বিরানা জায়গা তো। অনেকে নাকি অনেক কিছু দেখে।' তবে শোন। গাঁয়ের উত্তরে অনন্ত বাঁশবন। তার ভেতর যাস নে। আর লোক– জনের কাছে জেনে নিস মরা শ্মশান কোনটা। তার ধারে –কাছেও হাঁটিস নে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন হাঁটলে কি হ'বে?

কি হ'বে মানে? মামা খেঁকিয়ে উঠলেন। কিছু না হ'লে কি এমনি হাঁটতে মানা করছি? যা বলছি শুনে রাখ। আর শোন, শিরোলে যদি তোর রাতও হয়ে যায়, তবু কারু বাসায় থাকবি নে। যত রাতই হোক বাকশীর হাটে চলে আসিস। ওখানকার ডাকবাংলোতে আমার কথা বললেই খুলে দেবে।

মামার কথা শুনে দারুণ রোমাঞ্চ হলো। বললাম, তা মামা, ইকবালকেও সঙ্গে নেই না! ও যেতে চাইছিলো।

ইকবাল মামার ছেলে। শহর থেকে গাঁয়ে বেড়াতে এসেছে। ও সকালেই আমাকে বলেছিলো, আমিও ভাই তোমার সঙ্গে যাবো। তুমি বাবাকে একটু বুঝিয়ে বোলো। মামা একটু ইতস্ততঃ করলেন– ওকেও নিবি? তা যেতে চাইছে, যাক। তবে যা যা বললাম মনে রাখিস কিন্তু।

ইকবালকে গিয়ে খবরটা দিলাম। ও শুনে ভীষণ খুশি। হাজার হোক শহরের ছেলে। মরা শ্মশান আর অনন্ত বাঁশবন ওর মনেও কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছিলো। বললাম– যা নেবে গুছিয়ে নাও। বোধহয় দিন দুয়েক থাকবো।

ও একটু অবাক হলো– দুদিন কেন? বাবার কাজ তো একদিনেই হয়ে যাবে! বললাম, জায়গাটা ঘুরে বেড়াইতেই একদিন লাগবে। টর্চটা নিতে ভুলো না। গ্রামে গ্যাস ইলেকট্রিকের বাতি নেই। ব্যাটারি পাল্টে নিও। আর মামার গুপ্তি লাঠিটাও মনে করে নিও।

মামার একটা গুপ্তি লাঠি ছিলো। এমনি দেখতে সুন্দর বেড়াবার ছড়ির মত। তবে মাথার কাছে বোতাম টিপলে ভেতর থেকে চোখা একটা ইস্পাতের ফলা বেরিয়ে আসতো। এক হাত লম্বা ফলা। অনেকটা বর্শার মত। তখন লাঠিটাকে বর্শার মতো চালানো যেতো। বিপদ- আপদের ভালো হাতিয়ার। কখন দরকার লাগে বলা যায় না।

ইকবাল আর উচ্চবাচ্য করলো না। হয়তো কিছু আঁচ করতে পেরেছিলো।

যথাসময়ে রওনা হয়েছি। বাকশীর হাট পর্যন্ত পৌঁছতে কোন অসুবিধা হয় নি। দুপুরে ডাক বাংলাতে উঠলাম। ওখানকার দারোয়ানকে দিয়ে কিছু খাবার আনিয়ে নিলাম। বললাম, বিকেলে রওনা দিলে শিরোল পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

দারোয়ান ছাপরাইয়া হলেও সুন্দর বাংলা বলে। শুনে তো ওর চোখ কপালে উঠে

গেলো। বললো– শিরোল রওনা হবেন কিকেলে? বিকেলে রওনা হতে দোষ কি?

দারোয়ান ভয় পাওয়া গলায় বললো, দোষ না থাকলে কি এমনি বলছি বাবু? শিরোল যাবার হলে সবাই দুপুরের আগেই যায়। বিকেল নাগাদ পৌঁছে। বিকেলে গেলে সনঝে হয়ে যায়। সে জন্য বিকেলে কেউ যায় না।

বললাম, সাঁঝ হলে অসুবিধে হবে না। টর্চ আছে। তুমি বাপু পথটা বলে দাও। দারোয়ান তবু বললো, পথ বলতে আপত্তি নেই বাবু। তবে বিকেলে যাবেন না। টর্চ থাকলে কি!

আমি একটু অবাক হলাম দারোয়ানের ভয় দেখে বললাম, গেলে কি হবে খুলেই বলো না?

দারোয়ান বললো, অনেক কিছুই হয় বাবু। যারা বিকেলে শিরোলে গেছে তারা কেউ পৌঁছতে পারে নি। মরা শ্মশানের কাছে গেলেই আপনি দিক হারিয়ে ফেলবেন। সারা রাত ঘুরলেও পথ পাবেন না।

আমি রোমাঞ্চিত হ'লাম– মরা শ্মশান কি পথেই?

ভয়ে ভয়ে দারোয়ান বললো, হ্যাঁ বাবু।

বললাম, তাহলে আমরা এখনই রওনা হবো।

দারোয়ান হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, এখন গেলেও বাবু সনঝের আগে পৌঁছাতে কষ্ট হবে। পা চালিয়ে যেতে হবে। আমি রাস্তা বলে দিচ্ছি ভালো করে শুনুন। পথে কাউকে রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করবেন না।

দারোয়ান রাস্তা বলে দিলো। ভেবেছিলাম একটু গড়িয়ে নেবো, তা আর হলো না। ইকবালটার অবশ্য এক ঘুম হয়ে গেছে। ও এসেই ঘুমিয়ে নিয়েছে।

বাকশীর হাট পেরুতেই বুঝলাম, জায়গাটা একেবারেই বিরানা। কাদচিৎ দু' একটা স্থানীয় লোকের দেখা পাচ্ছি। পথে একটা কুকুর বেড়াল পর্যন্ত নেই। মামা বলেছিলেন, গতবার কলেরাতেই শিরোল এমন জনমানবশূন্য হয়ে গিয়েছিলো। ইদানিং দু' এক ঘর আবার আসছে, তবে একটা অহেতুক ভয় নাকি এখানকার লোকদের মধ্যে রয়ে গেছে। মাস তিনেক আগে জোড়া খুন হয়েছে শিরোলে। খুনের কোনো প্রমাণ নেই। খুনীরও নয়। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য বলে, 'তেনারাই নাকি গলা টিপে মেরেছেন। বাঁশ বনে সাদা কাপড় পরা সাত- আট হাত লম্বা 'তেনা'দের অনেকেই দেখেছে।

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেছি। একটু পিছিয়ে পড়েছি। ইকবালের ডাকে চমকে উঠলাম। ও বললে - কোনদিক যাবো? ডান দিকে না বাঁ দিকে?

দেখলাম সামনে সরু রাস্তা দু'দিকে দু' মাথা হয়ে চলে গেছে। যমকে দাঁড়ালাম, দারোয়ান কোনটার কথা বলছে? ডান না বাঁ ভাবছি। একবার মনে হলো ডান দিকে যেতে বলেছিলো। খেয়াল করতে পারছি না। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়েই একটা লোক বেরুলো। বোধ হয় সামনের জঙ্গলে কাঠ কাটছিলো। ওর কাছে জানতে চাইলাম শিরোলের রাস্তা কোনটা?

বাঁ দিকেরটা দেখিয়ে বললো, এ দিক দিয়ে গিয়ে পয়লা যে বাঁ হাতি তালগাছটা পড়বে সেটাকে বাঁয়ে রেখে সোজা উত্তরে যাবেন।

চলতে শুরু করলাম। আর একটু হ'লেই গিয়েছিলাম আর কি! যদি ডান দিকে যেতাম তাহলে বোধ হয় আর ফিরতে হতো না।

ইকবালটা কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগলো। একবার বললো লোকটার চাউনিটে যেন কেমন! আবার বললো, দারোয়ান কিন্তু কাউকে পথের কথা বলতে মানা করেছে। খুঁত খুঁতে লোক আমি পছন্দ করি না। ওকে ধমক দিলাম– চাউনি আবার কেমন হ'বে? গাঁয়ের লোকদের চাউনি অমনই হয়। আর পথ না বললে এতক্ষণে মরা শ্মশানে গিয়ে ভেলকি দেখতে।

ও চুপ মেরে গেলো। বাঁ হাতি তাল গাছটা চোখে পড়তেই বললাম, কেমন লোকটা কি ভুল বলেছিলো?

উত্তর দিকে রাস্তা নেই। ধু ধু মাঠ। দিক ভুল হওয়া বিচিত্র নয়! বহু দূরে গাছপালা দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম ওটাই শিরোল। মাঠে নেমে পড়লাম। আগে আগেই যাচ্ছি আমি, হঠাৎ পেছনে ইকবাল আর্তনাদ করে উঠলো। চমকে তাকালাম। ও হোঁচট খেয়ে পড়েছে। তুলে ধরলাম, লাগে নি তো?

ও মাথা নাড়লো। আঙুল দিয়ে পাশে দেখালো, ওই দেখো।

কি?

মানুষের মাথার খুলি।

চমকে উঠলাম, তাইতো! কিন্তু মানুষের মাথার খুলি এখানে? হঠাৎ বহু দূর থেকে মানুষের গলার স্বর শোনা গেল। কে যেন ডাকছে – বাবুরা ফিরে এসো। সামনে যেয়ো না! পেছন ফেরো।-

পেছনে তাকালাম। দূরে সেই তালগাছটার তলায় কে একজন দাঁড়িয়ে। হাতের ইশারায় ডাকছে। এক রকম দৌড়েই গেলাম। অনেক দূর এসে পড়েছিলাম। কাছে আসতেই লোকটা ব্যস্ত হয়ে বললো– বাবুরা কোথা যাচ্ছেন?

বললাম-শিরোল।

লোকটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো– কি সর্বনাশ! এটা যে বাকশীর মরা শ্মশান! আপনারা আগে আসেন নি কখনো?

না।

আপনারা উল্টো পথে এসেছেন। আসুন আমার সাথে আমি শিরোল যাচ্ছি। যেতে যেতে লোকটা বললো, আপনাদের কেউ পথ বলে দেয় নি?

ডাকবাংলোর দারোয়ান বলেছিলো কিন্তু ঠিক মনে রাখতে পারি নি। কিন্তু পথে একজন যে বললো বাঁ হাতে তালগাছ ফেলে সোজা উত্তরে যেতে?

কি সর্বনাশ বাবু! লোকটা আর কিছু বলেছে?

না, কেন?

তা বাবু আপনারা শিরোল কার কাছে যাচ্ছেন?

মানুষের মাথার খুলি এখানে----

সেজো চৌধুরীর কাছে।

উনি কি আপনাদের আত্মীয়?

না। মামার কাজে যাচ্ছি।

কে আপনার মামা?

রাশেদ আহমেদ চৌধুরী।

লোকটা চোখ বড় করে তাকালো বিস্মিত হয়ে বললো– রাশেদ চৌধুরী আপনার মামা?

হ্যাঁ, চেনেন নাকি?

আমার নাম হরদয়াল। বড় চৌধুরী আমাকে ভালো করেই জানেন। তা তিনি না এসে আপনাদের পাঠালেন যে?

তিনি কাজে আটকে গেছেন।

কিন্তু এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু!

কেন, কিসের সর্বনাশ?

লোকটা এদিক–ওদিক চাইলো। গলাটা একধাপ নামিয়ে বললো, আপনারা যে ফাঁসুড়ের পাল্লায় পড়েছেন!

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। বললাম– সে কি, ফাঁসুড়ে এখন আসবে কোত্থেকে? সে তো কোন যুগের কথা।

আস্তে বলুন। হরদয়াল চাপা গলায় বললো, এখানকার মাটিরও কান আছে।

ফাঁসুড়ে নেই বলে কি একেবারেই নেই? মেদিনীপুরের রাম ফাঁসুড়ের বংশের দু' একজন এখনো এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। আমার তো মনে হয় সেই ফাঁসুড়েদের কিছু শিরোলেও আছে। যে লোকটা আপনাদের পথ বলে দিলো, সেও নিশ্চয়ই ফাঁসুড়ের দলের হবে। আপনারা ফিরে যান বাবু। নজরে যখন পড়েই গেছেন, তখন আর রক্ষে নেই।

কেন জানি না একটা জেদ মনে চেপে বসলো। বললাম– এসেছি যখন তখন আর ফিরে যাবো না। দেখে যাবো এই ফাঁসুড়ে কারা।

ঠ্যাঙাড়ে আর ফাঁসুড়েদের কথা শুধু লোক মুখেই শুনেছি। ভয়ানক প্রকৃতির এরা। ঠ্যাঙাড়েদের অস্ত্র হচ্ছে লাঠি। ঘুরিয়ে পায়ে মারবে। এক বাড়িতেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে হয়। কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। ফাঁসুড়েরা আরও ভয়ঙ্কর। অস্ত্র শুধু এক টুকরো দড়ি না হয় গামছা। মাথায় দু' টুকরো সিসে বাঁধা থাকে। হঠাৎ এসে গলায় বাঁধিয়ে এক টান দেয় তাতেই শেষ। বেশি হাঙ্গামা করতে হয় না। নিপুন হাতের কাজ! খুনের বা খুনীর কোন প্রমাণ থাকে না।

হরদয়াল আস্তে করে বললো, আপনারা কিন্তু বাঘের গুহায় ঢুকতে যাচ্ছেন বাবু। কাজটা ভালো হচ্ছে কি? ওদের ঘাঁটিয়ে কেউ জ্যান্ত ফিরে যেতে পারে নি।

বিরক্ত হয়ে বললাম, ওরা যে এ ভাবে খুন করেই চলেছে, সেটাও তো ভালো কাজ হচ্ছে না।

কিন্তু আপনি আর আমি কি কোরবো বাবু? বাকশীর দারোগা বাবু পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেলেন!

আপনারা আমার সহযোগিতা পেলে নিশ্চয় এদের ধরতে পুলিশের অসুবিধা হবে না। যা করার আমরাই করবো। মামাকে যখন চেনেন, আপনি শুধু আমাদের সাথে থাকবেন।

বেশ বাবু, তাই না হয় থাকবো। আপনার মামার নেমক কম খাই নি। তা আপনারা বাবু সেজো চৌধুরীর কাজ সেরে আমার ওখানেই থাকবেন। চৌধুরীর বাড়িও তত নিরাপদ নয়।

শিরোল পৌছতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেলো। যাঁর কাছে গিয়েছিলাম তিনি মামাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। সম্পত্তি কি যেন গণ্ডগোল চলছিলো। মামা চিঠি দিয়েছেন। পুরোনো দলিল সব বুঝে নিতে বলেছেন। সেজো চৌধুরীর সাথে কাজ সারতে একেবারে অনেক রাত হয়ে গেলো। চৌধুরী বললেন, তোমরা থাকছো কোথায়?

বললাম, হরদয়ালের ওখানে।

মামার চিঠি পড়ে তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট হননি। তবু ভদ্রতার খাতিরে বললেন, আমার এখানে থাকলেও পারতে।

কি মনে করে বলে ফেললাম, বেশতো তা না হয় থাকবো।

ইকবাল ফিস ফিসিয়ে বললো, বাবা কিন্তু শিরোল থাকতেই বারণ করেছিলেন। তেমনি মৃদুস্বরে ওকে ধমকে দিলাম– চুপচাপ দেখে যাও। ও একটু দমে গেলো। সেজো চৌধুরী বললেন, কি ব্যাপারে! ভয় করছে বুঝি?

আমতা আমতা করে বললাম, তা একটু একটু করছে বৈকি। কেমন ছম ছমে ভাব চারিদিকে।

শুকনো হেসে তিনি বললেন, ঠিকই বলেছো বাবা। এতগুলো অপঘাতের মৃত্যু! রাতে অনেকে অনেক কিছুই দেখে। সাবধান থেকো। চেঁচিয়ে অনর্থ করো না। নতুন লোকেরা প্রায়ই ভয় পায়। এই সেদিনই তো দু'জন লোক এলেন। বাঁশ বনের মধ্যে কি দেখলেন কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে ভিরমি খেয়ে পড়ে একেবারে অক্কা। তোমাদের বাবা সাবধান করে দেই। রাতে তো দূরের থাক দিনেও বাঁশ বনের কাছে যেয়ো না।

ইকবাল ফস করে বলে বসলো, এখানে নাকি ফাঁসুড়েরা থাকে?

সজোরে ওর হাতে চিমটি কাটলাম। পাগল নাকি! ও বুঝতে পেরে কেমন থতমত খেয়ে গেলো।

সেজো চৌধুরীর মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলো। চোখে চোখ রেখে বললেন, এমন আজগুবি কথা কে বললো? হরদয়াল বুঝি?

আমি সামলে নিলাম। না, না! হরদয়াল কখন আবার বলবে? সেদিনকার কাগজে দেখেছিলাম যে দুটো খুন হয়েছে ওটা নাকি ফাঁসুড়েদের কাজ বলে সন্দ করা হচ্ছে।

একটু ধাতস্থ হলেন সেজো চৌধুরী। বললেন, কাগজআলারা তো অনেক কিছুই লেখে! ওতে কার গাঁজায় দোক্তা কম পড়েছিলো, তাই অমন লিখতে গেছে। আসল কথা

তো বললামই। রাত-বিরেতে তেনাদের নাম করতে নেই। একাজ তেনাদের ছাড়া আর কারু নয়! বললে পেত্যয় যাবে না বাবা। এই সেদিন আমার বিছানার পাশে সাদা মত একটা দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছিলো। দোয়া দরূদ পড়তে পড়তে চোখ বুঁজে সিঁটিয়ে রইলাম। তেনাদের আক্রোশ কখন কার ওপর পড়ে বলা যায় না। খানিক বাদে অবশ্য আপনা থেকেই মিলিয়ে গেলো হাই তুলে বললাম, আমাদের শোবার জায়গাটা তাহলে দেখিয়ে দিন।

সেজো চৌধুরী উঠে পড়লেন– আমার সাথে এসো।

চৌধুরীদের মস্ত বড় দোতালা বাড়ি। ঘরগুলোও বড় বড়। মাঝে মাঝে হারিকেন জ্বলছে। গোটা বাড়িটা জুড়ে কেমন একটা ভূতুড়ে ভাব। সেজো চৌধুরী একতালার শেষ মাথায় একটা ঘর দেখিয়ে বললেন–কম্বল পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাতে বাবারা ভয় পেয়ো না। দোয়া দরূদ পড়ে ঘুমিয়ো।

ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছিলো। সেজো চৌধুরী বেরিয়ে যাওয়ার পর ওটাকে কমিয়ে দিলাম। ইকবালকে বললাম, ঘুমিও না, আজ রাতে তেনাদের দেখবো।

তেনাদের মানে? অবাক হয়ে জানতে চাইলো ইকবাল।

মানে সেজো চৌধুরীর তেনাদের! রহস্য করে বললাম, রাত-বিরেতে যাদের নাম করতে নেই!

ইকবাল একটু ভয় পেলো। বললো, হরদয়ালকে একটা খবর পাঠালে হয় না?

খবর ও পেয়ে যাবে। আর কথা নয়, শুয়ে পড়ো। টর্চটা বালিশের তলায় রাখো, গুপ্তি লাঠিটা হাতের কাছেই থাক! সাবধান! ঘুমিয়ে যেও না।

ভাবছিলাম এতে নিশ্চয়ই সেজো চৌধুরীর হাত আছে। প্রথম থেকেই লোকটার ব্যবহার সুবিধের বলে মনে হয় নি। আমাদের আসাতে যে লোকটা মোটেই খুশি হয়নি তার কথা বার্তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলো মামারা কি আর এসব ভূতুড়ে জায়গায় সম্পত্তির ভাগ বসাতে আসবে।

বাইরে চাঁদ উঠেছে। আলো ছায়া মিলে একটা রহস্যময় ভাব। জানালার দুটো শিক নেই। কিছু ঢুকে পড়লে আটকানো যাবে না। দূরে বাঁশ বনে বাতাস লেগে কটকট আওয়াজ হচ্ছে। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই।

রাত বাড়ছে। একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে। হঠাৎ চমকে উঠলাম। বাইরে খস খস শব্দ শোনা গেল। টর্চ জ্বালাতে গিয়েও জ্বালালাম না। তাকালাম জানালার দিয়ে।

সাহসী বলে নিজেকে নিয়ে বেশ গর্ব বোধ করতাম। কিন্তু যা দেখলাম তাতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেলো। চাঁদের আলোতে পরিস্কার দেখলাম, সাদা কাপড় মোড়ানো সাত আট হাত লম্বা একটা মানুষ, হাতে লাঠি– এদিকেই আসছে। দেখেই মনে হয় ও এ পৃথিবীর বাসিন্দা নয়।

ইকবালকে ডাকলাম না। শুয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুধু দেখছি। দোয়া দরূদ পড়তেও ভুলে গেছি।

লোকটা একটা উঁচু বেদির মতা জায়গায় বসলো। উপুড় হয়ে পা থেকে কি যেন

খুললো। সাদা কাপড়টা গা থেকে খুলে রাখলো। লাফ দিয়ে বেদি থেকে নামলো। আবার চমকে উঠলাম। লোকটা আগের দৈর্ঘের অর্ধেক হয়ে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড!

লোকটা বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে পরিস্কার হয়ে গেলো। এক মুহূর্তে ভেবে নিলাম কি করতে হবে। ইকবালকে তুলে বললাম– আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। সাবধানে থেকো।

ও একেবারে ঘাবড়ে গেল, বললো, –কোথায় যাচ্ছো?

টর্চটা নিয়ে বললাম, ওপরে।

দরজা খুললে হয়তো চোখে পড়ে যাবো। এই ভেবে জানালা গলিয়ে বাইরে এলাম। সেই বেদিটার কাছে গেলাম। দেখলাম কাঠের দু' খানা লম্বা পায়ের মত। বুঝলাম এটাই রনপা। এতে করেই লোকটাকে অত লম্বা লাগছিলো।

সদর দরজায় দেখলাম কেউ কোথাও নেই। সেজো চৌধুরীর ঘরে আলো জ্বলছে।

হালকা পায়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটু দাঁড়িয়ে অন্ধকারটা চোখে সয়ে নিলাম। পা টিপে টিপে সেজো চৌধুরীর ঘরের কাছে দাঁড়ালাম। দরজা ভেজানো। ভেতরের কথা শুনতে পেলাম। দেখলাম, সেজো চৌধুরী আর একটা লোক। বুঝলাম এই লোকটাই একটু আগে এসেছে। লোকটা বলছে, আমি হলপ করে বলতে পারি কত্তা – এ হরদয়াল ছাড়া আর কারু কাজ নয়। আরও একদিন শয়তানটা মরা শ্মশান থেকে একজনকে ডেকে নিয়ে এসেছিলো।

এইবার সেজো চৌধুরী বললেন– ব্যাটাকে সাবড়েই দেনা। আজকের ছোঁড়া দু'টোকে কি না কি বলেছে! তাই একটা ছোঁড়া বলছিলো।

লোকটা শক্ত গলায় বললো, আপনার হুকুম পেলে তো এখনই দিতে পারি কত্তা। তবে ব্যাটা আবার সরকারী অপিসে কাজ করে। ঘাঁটাঘাটি হবে না তো?

ঘাঁটাঘাঁটি কেন হবে? সেজো চৌধুরী নির্বিকার গলায় বললো, একেবারে রূপনারাণে ফেলে দিয়ে আসবি। কেলে, নিধে, কানাই ওরা সব কখন আসবে?

কানাই আঁশতলা আর কেলে, নিধে, বলাই গেছে পাংশা। তিন পহর নাগাদ এসে পড়বে কত্তা।

তুই একাই যা। সেজো চৌধুরী হুকুমের গলায় বললো, হরদয়ালকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে আসিস। ও দু' টোর মত ফেলে রাখিস না। একটা ছোঁড়া বলছিলো খবরের কাগজঅলারা নাকি সন্দ করেছে আমাদের বলে।

লোকটা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, তা কর্তা পঞ্চাশটা টাকা যদি দিতেন-। সেজো চৌধুরী মুখ গম্ভীর করে বললেন– তাহলে খানিক বোস তুই। কত নিচ্ছিস হিসাব রাখিস?

উঠে ভেতরে গেলো সেজো চৌধুরী। সবগুলো চিন্তা এক সঙ্গে মাথায় জট পাকিয়ে তুললো। ঠিক করলাম হরদয়ালকে বাঁচাতেই হবে। ছুটে বেরিয়ে এলাম চৌধুরী বাড়ি থেকে। প্রাণপণে ছুটলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হরদয়ালের বাড়ি পৌঁছলাম। ডেকে তুললাম ওকে। বললাম, আপনি শিগগির বাকশীর থানা যান। দারোগা বাবুকে এক্ষুনি আসতে বলবেন সেদিনের খুনীর পরিচয় জানা গেছে। সঙ্গে চার পাঁচটা পুলিশ আনতে বলবেন, চৌধুরী বাড়ীতে!

হরদয়াল প্রথমে হা করে চেয়ে রইলো। তারপর জামাটা কাঁধে ফেলে ছুটলো। আমার উত্তেজিত ভাব দেখে বোধ হয় কোন কথা বলতে ওর সাহস হলো না।

হরদয়ালের ঘরে একটা কাঠের মুগুর পেয়ে সেটাকে হাতে নিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করে রইলাম। প্রতি মুহূর্তে সেই লোকটার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট দশেক পরেই লোকটা এলো। পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগলো বিছানার দিকে। দেরী করলাম না। প্রাণ পণে ওর ঘাড়ে মুগুরটা দিয়ে বাড়ি মারলাম। আঁক করে লোকটা লুটিয়ে পড়লো।

হঠাৎ ঘাবড়ে গেলাম। মরে যায়ান তো! নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখি না, নিঃশ্বাস পড়ছে। এক্ষুনি আবার হয়তো জ্ঞান ফিরে আসবে। ওর মুখে একটা গামছা পুরে বাঁধলাম শক্ত করে। হরদয়ালের ঘরে গরু বাঁধার দড়িটা দিয়ে পিছ মোড়া করে চৌকির সঙ্গে বেঁধে দিলাম।

বেশিক্ষণ থাকা আর নিরাপদ নয়। আবার চৌধুরী বাড়ীতে ফিরে এলাম। ইকবাল বললো- কি হলো? বললাম– পরে বলবো। এখন শুয়ে পড়ো। আমিও শুয়ে পড়লাম। চোখ কান দুটোই অবশ্য সজাগ রেখে। ঘন্টা দেড়েক কেটে গেছে। দেখলাম রণপা পরা চারটে লোক এলো। সেই বেদির কাছে পা খুলে ওপরে গেলো।

সজাগ হয়ে রইলাম। এ সময়ে ঘুমোনো মানে শেষ। ঘড়িটা দেখলাম। রাত সাড়ে তিনটে। আরও আধ ঘন্টা কাটলো। হঠাৎ দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনলাম।

ভোজানো দরজাটা খুলে গেলো। দুটো লোক ঢুকলো। একজন বললো, ছোঁড়ারা ঘুমুচ্ছে। কিছু আঁচ পায়নি তাহলে অপরজন বললো– না পেলেই ভালো। পেলে এতক্ষণে চেচিয়ে হয়তো কুরুক্ষেত্তর বাঁধাতো।

প্রথম জন হেসে বললো, চল। কত্তার ঘরেই বসিগে, হিসেবটা দিতে হবে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তারা বেরিয়ে গেলো। মনে মনে হাসলাম। ইকবাল ফিশ ফিশ করে বললে, এ সব কি হচ্ছে বলতো? বললাম পরে বলবো। কথা বোলো না।

দারোগা এলেন প্রায় সোয়া চারটার দিকে। জিপটা দূরেই রেখে এসেছেন। ইকবালকে নিয়ে বাইরে এলাম। বললাম, সবকটা আপাতত সেজো চৌধুরীর ঘরে। সেজো চৌধুরী সুদ্ধ দলে রয়েছেন। একটা হরদয়ালের বাড়িতে বাঁধা আছে।

এরপর কি হল আর বোধ হয় বলতে হবে না। যথারীতি গ্রেফতার হল সবাই। কাগজে বেশ হই চই হলো। ছবি -টবি উঠলো। মামলার রায়ে সবকটার দীপান্তর হলো।

পরে ওদের মুখে শুনেছিলাম– ফাঁসুড়ে নকি ওদের সাথেই শেষ। আর কোনো ফাঁসুড়ের খবর এরপর পাওয়া যায় নি।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রাঙাদাদুকে বাগান করার নেশা ভালো মতই পেয়েছিলো। বদনার বাপকে দিয়ে খালি জায়গা সব কুপিয়ে পেছনের বাগানে মরিচ আর বেগুনের চারা লাগিয়েছেন, সামনের জায়গায় গাঁদা আর কলাবতী। বড় বিবিদাদু একদিন বললেন, এই ছায়ার ভেতর গাঁদা ফুটবে কে বললো তোমাকে? দক্ষিণের গাছটা না কাটলে রোদ পাবে না যে!

রাঙাদাদু চমকে উঠলেন– কম করে হলেও একশ' বছরের পুরোনো গাছ হবে। এ গাছ তুমি কাটতে বলো।

পুরোনো বলেই তো বলছি। বড় বিবিদাদু মৃদু হেসে বললেন, সেদিন তোমার বড়দা বলছিলেন, গাছটার বয়স হয়েছে অনেক, কবে গোড়ার কাঠে পচন ধরে, তার আগে কেটে ফেলা দরকার। দুই নাতনির বিয়ে সামনে, ফার্নিচার বানাতে হবে।

তোমরা যদি বলো তাহলে কাল লোকজন ডাকি। শুকনো গলায় রাঙাদাদু বললেন, তবে মানতের জন্য পাঁচ সিকে দিও। কে জানে কেউ যদি নারাজ হয়!

গাছ কাটলে কে নারাজ হবে রাঙাদাদু? রাতের আসরে নিরীহ গলায় জানতে চাইলো শামু।

রাতের বেলা সে সবের নাম নিতে হয় না বাছা। রাঙাদাদু তামাকের মিষ্টি ধোয়া ছড়াতে ছড়াতে বললেন, তাছাড়া গাছেরও তো প্রাণ আছে।

ছোটন বললো, সে কথা তো বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুই বলেছেন। সব গাছেরই প্রাণ আছে। তুমি বাগান করতে গিয়ে যেসব আগাছা তুলেছো তারও প্রাণ আছে।

দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে তোরা সব গুহ্য কথা জেনে ফেলেছিস বুঝি? আমি বৈজ্ঞানিক প্রাণের কথা বলছি না। বিজ্ঞানের বাইরেও একটা জগৎ আছে, যেখানে যুক্তি দিয়ে কোন কিছুর বিচার চলে না। সব মানুষ সে জগতের সন্ধানও জানে না। অল্প কিছু মানুষ সে সব দেখতে পায়। তবে যারা দেখে তারা বেশি দিন বাঁচে না। আমার ওপর মুরুব্বিদের দোঁয়া ছিলো বলে এত কিছু দেখেও এত কাল বেঁচে আছি। এই বলে রাঙাদাদু থামলেন। আলবোলার শুধু গুড়ুর গুড়ুর শব্দ হতে লাগলো।

গাছের কি দেখেছো তাই বলো না? জানতে চাইলো শামু।

কত কি দেখেছি গাছের, বলে কি শেষ করা যাবে। এই বলে একটু আনমনা হয়ে গেলেন রাঙাদাদু। তারপর বললেন, গাছের দুঃখ দেখেছি, রাগ দেখেছি, প্রতিহিংসা দেখেছি। গাছ কখনও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

ছোটন বললো, আফ্রিকার জঙ্গলে মানুষ খেকো গাছ আছে।

সে তো সবাই দেখতে পায়। রাঙাদাদু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি যার কথা বলছি সে সব গাছ সবাই দেখতে পায় না। আমি দেখেছিলাম ভার্জিনিয়ার জঙ্গলে। ছোটদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য আবার থামলেন রাঙাদাদু।

কি দেখেছো তাই বলো না দাদু। আবদার জানালো শামু।

একটু নড়েচড়ে বসে রাঙাদাদু বললেন, আমি তখন আমেরিকার মেরিল্যান্ডে। বড় এক খামারে ম্যানেজারি করি। খামারের মালিক বুড়ো প্যাট এন্ডারসন খুবই ভালো মানুষ, আমাকে নিজের ছেলের মত দেখতো। সেবার ক্রিসমাসের দু'দিন আগে বললো, বাছা, ভার্জিনিয়াতে আমার বুড়ো মামা মামী থাকে। মার এক মাত্র ভাই। অনেক বয়স হয়েছে। বহুদিন ওদের খোঁজ খবর পাই না। গত বছর ক্রিসমাসে কার্ড পাঠালাম, ইস্টারে চিঠি দিলাম, কোন উত্তর নেই। তুমি কি দয়া করে একবার ওদের দেখে আসবে?

আমি বললাম, অসুবিধে কেন হবে? ভার্জিনিয়া তো এমন কিছু দূর নয়। ওয়াশিংটন ডিসির ওপর দিয়ে ঘন্টা খানেকের ড্রাইভ।

প্যাট বললো, ওরা একটু ভেতরের দিকে থাকে। ঘন্টা তিনেক লাগবে যেতে। মাঝখানে পুরোনো ডেডউড ফরেস্ট পড়বে। ওরা লোকালয় থেকে বেশ দূরে একটা র‍্যাঞ্চে থাকে। ঠিকানা দিচ্ছি। রাস্তা এঁকে দিচ্ছি। দেখা করে তুমি দিনে দিনে ফিরে আসতে পারবে। চিঠিতে ওদের আসতে বলেছি, যদি আসতে চায় সঙ্গে করে নিয়ে এসো। সঙ্গে ভাঁড়ার থেকে কিছু পনির আর রুটি নিয়ে যাও। মামী পনির খুব পছন্দ করে।

পরদিন সকালে বেরুতে বেরুতে দশটা বেজে গেলো। ভোরবেলা প্যাট গিন্নি বললো, ওরা আসবে না, ওদের জন্য দুটো কেক আর টার্কির রোস্ট করে দিচ্ছি। বলবে বড়দিনের উপহার। আমার তো মনে হয় না বড়দিনে ওদের কেউ দেখতে যায়।

প্যাটের মামা মামীর জন্য জিনিষপত্র সব গুছিয়ে খামারের পুরোনো জিপটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্যাট বুড়ো বার বার বলে দিয়েছে ডেডউড জায়গাটা বেশি ভালো নয়, ওখানে যেন রাত না করি। দেরি হলে যেন রাতের বেলাটা মামার র‍্যাঞ্চে থেকে যাই। সাবধানের মার নেই বলে সঙ্গে দোনলা বন্দুকটাও দিয়ে দিলো। স্পীডে গাড়ি চালালাম। সেই রাতে অচেনা বুড়ো বুড়ির বাড়িতে থাকার ইচ্ছে মোটেই ছিলো না। কারণ রাতে আমাদের পাশের ম্যাকেঞ্জিদের খামারে জমজমাট বলনাচের পার্টিতে নেমন্তন্ন হয়েছে। বুড়ো ম্যাকেঞ্জির মেয়ে মার্থা বার বার বলেছে যেতে।

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ডেডউড ফরেস্টে এসে গেলাম। প্যাট বুড়ো সুন্দরভাবে রাস্তার নকশা এঁকে দিয়েছে। কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করতে হয় নি। কাঠের ফলক দেয়া চিহ্ন দেখে বনে ঢুকলাম। দুপাশে ঘন গাছ পালা। মাঝখান দিয়ে সরু এক চিলতে

রাস্তা। শুকনো পাতা পুরু হয়ে পড়েছে। বোঝাই যায় এ পথ দিয়ে লোকজন খুব একটা যাওয়া আসা করে না। অন্তত রাস্তার চেহারা দেখে এটুকু বোঝা যাচ্ছিলো, গত একমাস কেউ এর ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যায় নি।

তখন ভরদুপুর হলেও গাছপালা এত ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে যে, সূর্যের আলো খুব সামান্যই চোখে পড়ছিলো। পাতার আড়ালে আকাশ ঢাকা পড়েছে। তবে আলো যত কমই থাক না কেন গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধে হচ্ছিলো না। শুধু স্পীড কমাতে হয়েছে। ঘন্টা খানেকের মতো মোটামুটি নির্বিঘ্নে বনের ভেতর গাড়ি চালিয়ে আনলাম। প্রথম বিপদ দেখা দিলো কাঠের পুলের কাছে এসে। প্যাট ওর নকশায় এই পুলটাও দেখিয়েছিলো। একটা গভীর খালের মত বনের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। শীতকাল বলে তলানিতে একটুখানি পানি পড়ে আছে। দু'দিকের পাড়ই একেবারে খাড়া উঠে গেছে। রাস্তার ওপর তিরিশ হাতের মত লম্বা কাঠের পুল। পাশে একটা গাড়ি চলার মত চওড়া হবে। বিপদ অবশ্য পুলের লম্বা চওড়ার জন্য নয়, কাছে এসে মনে হলো পুলের কাঠগুলো এত পুরোনো যে, জিপের ওজন সহ্য করতে পারবে না।

গাড়ি থামিয়ে নামলাম। পুলের ওপর হেঁটে দেখলাম, দশ পনেরো জন মানুষ এক সঙ্গে হাঁটলেও কিছু হবে না, কিন্তু জিপের অর্ধেক ওজন নিতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেলো।

একবার ভাবলাম জিপ রেখে বাকি পথটা হেঁটে চলে যাই। হিসেব করে দেখলাম, আরো এক ঘন্টার ড্রাইভ, হেঁটে গেলে পাঁচ ছয় ঘন্টা লেগে যাবে। এত সব মালপত্র নিয়ে এতদূর হাটা কি সম্ভব? মালপত্র রেখে যাবো, সে ভরসাও পাচ্ছিলাম না। প্যাট বুড়ো বার বার বলেছে বনের ভেতর বিপদ আছে। বিপদ মানে তো চোর ডাকাতের উৎপাত। জিপটাই নিয়ে যায় কিনা সে ভয়ও দেখা দিলো।

ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না, এদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। শেষে বিরক্ত হয়ে ঠিক করলাম, কপালে যা থাকে এই পুলের ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যাবো। যেই ভাবা সেই কাজ। আগে গাড়িটাকে হালকা করার জন্য জিনিষপত্র সব পুলের ওপরে নিয়ে রেখে এলাম। গাড়ির সিটগুলো খোলা যেতো। ওগুলো পর্যন্ত খুলে ওপারে রেখে এলাম। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও হালকা মনে হলো। তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অতি সাবধানে পুলের ওপর উঠলাম।

একটু একটু করে এগুচ্ছি, অর্ধেক গাড়ি পুলের ওপর উঠেছে, তখনই মচ-মচ করে পুরোনো তক্তাগুলো আর্তনাদ করে উঠলো। হাতটা একটু ফেঁপে উঠলো, প্রচণ্ড শীতের ভেতর টের পেলাম, গরম কাপড়ের তলায় কুল কুল করে ঘামছি। নার্ভ শক্ত করে গাড়ির এক্সিলেটরে তিল তিল করে চাপ দিতে লাগলাম। আস্তে আস্তে পুরো গাড়িটাই পুলের ওপরে উঠে এলো। ভয়ে আর উত্তেজনায় দম আটকে আসতে চাইছিলো। আরো একটু এগুলাম, সঙ্গে সঙ্গে মট মট শব্দ হলো। মনে হলো আমারই পাঁজরের দুটো হাড় বুঝি ভেঙে গেলো। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম এই বুঝি গোটা পুলটা ভেঙে জিপ সুদ্ধো খালের গভীর খাদে গিয়ে পড়ি। না, দুটো তক্তা ভাঙার পর আর শব্দ হলো না।

জেমস ঠিক তোমার মতো জেদী ছিলো----

নেমে দেখলাম পেছনের একটা চাকা সামান্য বসে গেছে। আবার গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিলাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে এগুতে পুলের মাঝামাঝি এসে গেলাম। মচ মচ শব্দ হচ্ছে কিন্তু কাঠ ভাঙে নি। একটু আশ্বস্ত হয়ে বেখেয়ালে এক্সিলিটরের ওপর চাপটা বেশিই দিয়ে ফেলালাম। গাড়ি লাফ দিয়ে কয়েক হাত এগিয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে দুই চাকার নিচে তক্তা ভাঙ্গার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। কপালে যা থাকে, এক্সিলেটরের চেপে ধরলাম। সামনের চাকা রাস্তায় উঠে পড়েছে। সমানে তক্তা ভাঙছে মট মট করে। পেছনের চাকা রাস্তায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভারী কাঠ ভাঙ্গার শব্দ পেলাম। গাড়ি থামিয়ে তাকিয়ে দেখি রাস্তা থেকে আলগা হয়ে পুরো পুলটা একপাশে কাত হয়ে গেছে। এরপর এখান দিয়ে গাড়ি যাওয়া দূরে থাক, জন মানুষও যেতে পারবে না।

মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গোলো। এ রাস্তা দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে কি আজ রাতে ম্যাকেঞ্জিদের নাচের পার্টিতে যেতে পারবো না? রাগে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছিলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি এই অসভ্য পুলটা পেরুতে একঘন্টা সময় নষ্ট হয়েছে। জিনিষপত্র সব আবার জিপে তুলে রওনা হলাম। প্যাটের মামা মামী নিশ্চয়ই বলতে পারবে এখান থেকে শহরে যাবার আর কোন রাস্তা আছে কি না। রাস্তা আরো পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে আমি এক রকম নিশ্চিন্ত। কারণ যে রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, সেটা একটা পরিত্যক্ত রাস্তা। মাঝে মাঝে ডাল- পালার ফাঁকে মাকড়সার জাল দেখে মনে হচ্ছিলো বহুদিন এ রাস্তা যে কেউ ব্যবহার করে না।

তিন ঘন্টার জায়গায় সাড়ে চার ঘন্টা লাগলো প্যাটের মামার বাড়িতে আসতে। শুনেছিলাম মামা নাকি মস্ত পয়সাওয়ালা লোক। বাড়ির হাল দেখে তা মনে হলো না। কাঠেল দোতলা বাড়ি, এককালে খুব সখ করেই বানিয়েছিলো, বারান্দার রেলিং আর থামের নকশা দেখলে বোঝা যায়। তবে গত কয়েক বছরে রঙ করা দূরে থাক ঝাড়ামোছার কাজও কেউ করে নি। লনে শুকনো ডাল পাতা পড়ে একাকার হয়ে আছে। বারান্দা, রাস্তা সব জায়গায় একই অবস্থা। ভয় হলো বুড়ো বুড়ি, আছে তো বাড়িতে। বাইরে থেকে বাড়ির চেহারা দেখে মনে হয় না। সেখানে কোন মানুষ জন থাকে।

সিড়ির কাছে গাড়ি থামিয়ে দু' বার হর্ন দিলাম। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। নেমে আশে পাশে তাকালাম। বারান্দায় উঠে দেখলাম, দরজায় বাইরে থেকে তালা দেয়া নেই, ভেতর থেকে বন্ধ। আশ্বস্ত হলাম, তার মানে ভেতরে লোক আছে।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে ডাকলাম, বাড়িতে কেউ আছেন?

একটু পরে ভেতর থেকে একটা ফ্যাশফেশে গলা শুনলাম –কে?

বললাম, আমি প্যাট এণ্ডারসনদের ম্যানেজার। ওরা আপনাদের জন্য কিছু উপহার পাঠিয়েছে। দরজাটা দয়া করে খুলবেন?

ভেতর থেকে আগের সেই গলা শোনা গেলো– দরজা খোলা আছে। তুমি দয়া করে ভেতরে এসো।

দরজাটা ভেজানো ছিলো। ঠেলতেই খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকতেই একটা স্যাতসেতে ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিলো।

ওটা বসার ঘর। সব কিছু মলিন, আগোছালো। কোণে রকিং চেয়ারে বসে আছে এক খুন খুনে বুড়ি। মুখটা শুধু দেখা যাচ্ছে। বাকি সব পোষাকে ঢাকা। এমন কি হাতে পায়েও মোজা পরা। নিজের বাড়ির ভেতর কেউ হাতে পায়ে মোজা পরে আমার জানা ছিলো না। ভাবলাম, বয়স হয়েছে, শীতে বোধ হয় বেশি কাবু করে ফেলেছে।'

টুপি খুলে বুড়িকে নিয়ম মত অভিবাদন জানিয়ে প্যাটের চিঠিটা দিলাম। বললাম, জিনিষপত্র কি এ ঘরে আনতে পারি?

বুড়ি মাথা নেড়ে সায় জানালো। প্যাটদের দেয়া খাবার দাবার সব ঘরে এনে ডাইনিং টেবিলটার ওপর রাখলাম। বললাম, আপনাদের জন্য প্যাট আর প্যাট গিন্নি ক্রিসমাস কেক পাঠিয়েছেন, টার্কির রোষ্ট, পনির আর জিঞ্জারব্রেড পাঠিয়েছেন। ওদের খামারের কচি শাসা আর টমাটোও দিয়েছেন, শিশিতে টমাটো আর মেয়োনেজ সস আছে। মিঃ জেমস কোথায়?

বুড়ি চুপ করে বসে রইলো। আস্তে আস্তে কান্নায় ওর চোখ দুটো ভরে এলো। বললো, তুমি ওখানে বসো।

ডাইনিং চেয়ারে বসলাম। দেখি বুড়ি কাঁদছে। কয়েক ফোঁটা পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে বুড়ি রুমালে চোখ মুছলো। বিব্রত হয়ে বললাম, আমি কি অসাবধানে আপনার মনে কোন আঘাত দিয়েছি?

বুড়ি মাথা নাড়লো, – না, তুমি জেমসের কথা জিজ্ঞেস করলে, তাই! একটু থেমে বুড়ি আস্তে আস্তে বললো, জেমস আর বেঁচে নেই।

শুনে খুব খারাপ লাগলো। বললাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস জেমস। আপনি আমার সমবেদনা গ্রহণ করুন।

বুড়ি আস্তে আস্তে বললো, ঠিক আছে বাছা।

বুড়ি কান্না লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ মনে হলো, বুড়ি যে কাঁদছে চোখের পানির রংটা কেমন যেন সবুজ সবুজ। বুড়ির চোকের রংও সবুজ। ওদেশে অবশ্য সবুজ ধরনের চোখের রংও দেখা যায়। বুড়ি চোখের পানি মুছে ফেললো। ভাবলাম, আমারই দেখার ভুল।

একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বুড়ি আমার দিকে তাকালো। ফ্যাঁশফেশে গলায় বললো, কতদিন মানুষের চেহারা দেখিনি! তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।

আমি বললাম, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। মিসেস প্যাট বার বার বলে দিয়েছেন আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে।

বুড়ি মাথা নাড়লো – না, বাছা, তা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, ওদের কোন অসুবিধে হবে না। ওরা বরং খুশিই হবে বড়দিনে আপনাকে কাছে পেলে। এখানে একা কি করবেন?

বুড়ি ম্লান হেসে আবার বললো, সম্ভব নয় বাছা।

জানতে চাইলাম, কেন সম্ভব নয়?

বুড়ি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, তোমার

নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে? সমস্যা হচ্ছে, তোমাকে খেতে দিতে পারি আমার ঘরে তেমন কিছুই নেই।

যদিও ভীষণ খিদে পেয়েছিলো, বললাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আসার সময় আমি ভালো মত খেয়ে এসেছি। রাতে একবারে খেয়ে নেবো।

বুড়ি বললো, তুমি যদি কিছু মনে না করো, পনির আর টমাটো দিয়ে জিঞ্জার ব্রেডের ক'টা স্যান্ডউইচ বানিয়ে খাও। মেয়োনেজও তো এনেছো দেখছি।

আমি বললাম, আপনি পনির ভালোবাসেন। এসব আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

ভাবলাম বুড়ি বলছে বাড়িতে খাবার নেই। আমার সঙ্গে যদি ও না যায়, যে খাবার এনেছি তাতে বেশ কয়েকদিন চলে যাবে। বুড়ির খাবারে ভাগ বসাতে ইচ্ছে হলো না।

বুড়ি বল্‌লো ওসব খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু লিকুইড খাই।

এ কথা শোনার পর অবশ্য খাওয়া যেতে পারে। বুড়ির কথা মতো গোটা তিনেক স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেললাম।

বুড়ি একমনে তাকিয়ে আমার খাওয়া দেখছিলো। একটা স্যান্ড্‌উইচ খাওয়ার পর বললো, তুমি টমাটো শশা বেশি করে খাও। আমার এখানকার পানি ভালো নয়।

ওদেশের লোকেরা পানি খাওয়ার ব্যাপারে খুব খুঁত খুঁতে। পারতপক্ষে ওরা পানি খায়ই না।

বললাম, আমাদের অভ্যাস আছে। ওতে কোন অসুবিধে হয় না।

বুড়ি, একটু রেগে গেলো। ফ্যাঁশফেশে গলায় বললো, আমি বলছি তুমি এ বাড়ির পানি খাবে না। ডেডউডের কোথাও তুমি পানি খাবে না। এ কথা আমি তৃতীয়বার বলবো না।

বললাম, ঠিক আছে, আপনি যদি চান তাই হবে।

শুনে বুড়ি যেন আশ্বস্ত হলো– কিছু মনে করো না বাছা। আমি তোমার মঙ্গল চাই। এ বুড়িকে এতদূর থেকে তুমি দেখতে এসেছো ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

বেশি করে টমাটো আর শসা খেয়ে পানির তেষ্টা কমালাম। তারপর বুড়িকে পুল ভাঙার ঘটনাটা বলে জানতে চাইলাম, শহরে যাওয়ার আর কোন রাস্তা আছে?

আমার কথা শুনে বুড়ি গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো, আছে একটা, কিন্তু যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে।

বললাম, রাস্তা থাকলে অসুবিধে কি? গাড়ির হেডলাইট আছে। সঙ্গে পাঁচ ব্যাটারির টর্চও আছে।

বুড়ি মাথা নাড়লো– ওতে কাজ হবে না। অন্য রকম বিপদ আছে। প্যাট কিছু বলে নি?

বলেছিলেন বৈ কি। রাতে বনের ভেতর দিয়ে যেতে মানা করেছেন। আপনি যদি চোর ডাকাতের কথা কিম্বা জন্তু জানোয়ারের কথা বলেন, আমি সামলাতে পারবো। আমার সঙ্গে দোনলা বন্দুক আছে।

বুড়ি শক্ত গলায় বললো, আমি ওসবের কথা বলছি না। অন্য রকমের বিপদ

আছে। বন্দুকেও কাজ হবে না।

বললাম, আমার যে আজ ফিরে যাওয়া খুবই জরুরি! আপনি দয়া করে পথ বলে দিন।

আমার কথা বুড়ির কানে গেছে বলে মনে হলো না। আপন মনে বুড়ি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো, জেমস ঠিক তোমার মত জেদী ছিলো। কি লাভ হলো জেদ দেখিয়ে!

বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বিকেলের সূর্য ডেডউডের ফরেষ্টের আড়ালে হারিয়ে গেছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। বুড়ির কথা ভেবে মায়া হলো। এই জঙ্গলের ভেতর একটা মানুষ দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একা কাটিয়ে দিচ্ছে। ওসব দেশে বুড়ো বয়সটা রীতিমত অভিশাপের মত। ছেলেমেয়েরা কেউ দেখে না। আত্মীয় স্বজন কেউ খোঁজ খবর নেয় না। এই বুড়ি আজ বাদে কাল মরবে। তার আত্মীয় স্বজন বন্ধু -বান্ধব কেউ জানবে না, কখন মরেছে। এখানে বুড়িকে কবর দেবারও তো কেউ নেই। ঠিক করলাম রাতটা বুড়ির কাছে থেকে কাল জোর করে ওকে প্যাটদের বাড়িতে নিয়ে যাবো। বুড়ির সম্পত্তির ওপর নজর পড়েছে, তখন শেষ বয়সে ওর দেখা শোনা করাটাও তো ওদের কর্তব্য।

হঠাৎ দেখি বুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দু চোখ বেয়ে দরদর করে পানি পড়ছে। আমি তাকাতেই বুড়ি চোখের পানি মুছে ধরা গলায় বললো, বাছা, তোমার মনটা ভারি নরম। তোমার মত আমার যদি একটা ছেলে থাকতো।

একটু হেসে বললাম, আজ রাতে আমি আপনার কাছে থাকবো।

বুড়ি মৃদু হেসে মাথা নড়ালো। বললো, তারপর কাল আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে তাই তো?

অবাক হয়ে বললাম, হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম। আপনি বুঝলেন কি করে?

আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে বুড়ি বললো, আমি মানুষের মনের কথা টের পাই।

এরকম অবশ্য কোথায় যেন পড়েছিলাম, টেলিপ্যাথি না কি যেন বলে, কোন কোন মানুষের এরকম ক্ষমতা থাকে। বললাম, মনের কথা যখন জানেন তখন যেতে আপত্তি করছেন কেন? আপনি এটাও নিশ্চয় জানেন, প্যাটদের ওখানে আপনার কোন অযত্ন হবে না?

জানি, ওরা আমার যত্ন করবে সম্পত্তির লোভে। বুড়ি শান্ত গলায় বললো, আর তুমি আজ রাতে আমাকে সঙ্গ দিতে চাও, কাল সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও, আমার জন্য তোমার মনে মায়া জন্মেছে বলে। একটু থেমে কি যেন ভাবলো বুড়ি। তারপর আপন মনে বললো, কিছু যদি কাউকে দিয়ে যেতে হয়, তোমাকে নয় কেন?

আমার মনে হলো একটু মায়ার কথা শুনে বুড়ি বোধ হয় হুশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বললাম, টেক্সাসে আপনার ভাইপো আছে, মিনিসোটাতে বোনের মেয়ে আছে, মেরিল্যাণ্ডে ভাগনে আছে, আপনাদের সম্পত্তি ওদেরই পাওয়া উচিৎ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ি বললো, হ্যাঁ, কাউকে যদি দান করে দিয়ে না যাই তাহলে আইনত ওরাই পাবে, তুমি যাদের কথা বললে। অথচ শেষ কবে ওদের চেহারা দেখেছি আমি মনেও করতে পারছি না।

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম, রাস্তাঘাট ভালো নয় বলে সবাই হয়তো আসতে পারে না। মিঃ প্যাট আপনাদের গত ক্রিসমাসে কার্ড পাঠিয়েছে, ইষ্টারে চিঠি পাঠিয়েছে, আপনারা জবাব দেন নি।

বুড়ি মৃদু হেসে বললো, জবাব না পেয়ে ওর একবারও মনে হয়নি বুড়ি বেঁচে আছে না মরে গেছে? বিপদ -আপদে কিছু হয়েছে কি না?

আমি প্যাটের পক্ষ নিয়ে বললাম, সে জন্যেই তো আমাকে পাঠিয়েছে খোঁজ খবর নিতে, আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

হ্যাঁ আট মাস পরে। এই বলে বুড়ি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর বললো, আমার সম্পত্তির ওপর সবার খুব লোভ।

বললাম, ঠিক আছে, যদি ইচ্ছে না করে আপনি কোন হাসপাতাল বা বুড়োদের হোমে আপনার সম্পত্তি দান করে যেতে পারেন। আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি করবেন না।

বুড়ি করুণ গলায় বললো, তোমাকে তো বলেছি বাছা, সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? গোয়ারের মত জানতে চাইলাম আমি।

বুড়ি আমার চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললো, আমার শেকড় গজিয়ে গেছে।

শেকড় মানে আর ঘর-বাড়ি, সয় সম্পত্তি এসব তো! বললাম তো ওসব দান করে দেবেন যেখানে আপনার পছন্দ।

বুড়ি ম্লান হাসলো না বাছা, সত্যিকারের শেকড়। এই দেখো না। বলে বুড়ি গ্লাভসগুলো খুলে হাতটা আমার সামনে বাড়িয়ে দিলো। কাছে এসে মনে হলো, শক্ত কোন চর্মরোগ হবে। হাতটা একটু গোল হয়ে গেছে। দেখে মনে হয় না সেখানে রক্ত চলাচল করে। নখ মরে গেছে, সরু সরু আঙুলের ডগায় ফাঙ্গাসের মত কি যেন। বললাম, আপনার ডাক্তার দেখানো উচিৎ।

বুড়ির মুখের হাসি আরো করুণ হয়ে গেলো– এটা সারানো কোন ডাক্তারের বিদ্যায় কুলোবে না। আরো দেখো। এই বলে এক পায়ের মুজো খুলে ফেললো।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে – একি, বলে আর্তনাদ করে উঠলাম। বুড়ি আবার মুজো পরে বললো, বলেছিলাম না শেকড় গজিয়ে গেছে।

এক বর্ণও বাড়িয়ে বলেনি বুড়ি। সত্যি সত্য শেকড় গজিয়ে গেছে বুড়ির পায়ে। গাছের যেমন শেকড় থাকে ঠিক সেরকম। পায়ের আকৃতিও অনেকটা গাছের গুড়ির মত হয়ে গেছে। আঙুলের মাথায় বাড়তি কি যেন মরা শেকড়ের মত ঝুলছে। রঙ ও সেরকম। নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর অসুখ হবে। বুড়ির কষ্ট দেখে বুক ঠেলে কান্না আসতে চাইলো। ধরা গলায় বললাম, কি করে এমন হলো মিসেস জেমস?

বলবো তোমাকে। সবই বলবো। তার আগে এক কাজ করো। বুড়ি ব্যস্ত গলায় বললো, আমার চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। তুমি গিয়ে ওপরে নিচে যত আলো আছে সব জ্বেলে দাও। কারেন্টর ভরসা নেই। কয়েকটা হারিকেন আছে ভাঁড়ারে। তেল ভরে ওগুলো এখানে এনে দরজা জানালার কাছে জ্বেলে দাও। যাও, দেরি করো না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

মনে পড়লো আজ ক্রিসমাসের রাত। বুড়ি নিজের বাড়িতে বোধ হয় শেষ বারের মত ক্রিসমাস পালন করবে। ওর কথা মত সারা বাড়ির সবগুলো আলো জ্বেলে দিলাম। পাঁচটা হারিকেনে তেল ভরে ঝেড়ে মুছে আলো জ্বালালাম। বুড়ির কথা মত ওগুলো এনে চারটা বসার ঘরের দরজার জানালার কাছে রাখলাম। আরেকটা কোথায় রাখবো জিজ্ঞেস করতে বুড়ি বললো, ওটা আমার চেয়ারের কাছে রাখো।

এরপর বুড়ি বললো, তুমি আমার শোয়ার ঘরে যাও। ড্রেসিং টেবিলের ওপর কাঠের আলমারির চাবি পাবে। আলমারি খুলে দেখো ওপরের তাকে দশটা থলে রয়েছে। ওগুলো নিয়ে এসো।

আমি কোন কথা না বলে শোয়ার ঘরের আলমারি খুলে থলেগুলো নামালাম। ভেতরে ঝনঝন শব্দ হতেই বুঝলাম কাঁচা টাকা। বুড়িকে থলেগুলো এনে দিলাম। বুড়ি বললো, প্রত্যেক থলেতে এক হাজার সোনার গিনি আছে। জর্জ ওয়াশিংটনের আমলের। একটার দাম হাজার ডলার। এগুলো সব তোমার। কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। যাও জিপে গিয়ে রেখে এসো।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, এ কি করছেন আপনি, কেন এসব নিতে যাবো? বুড়ি আমার মনের কথা জানতে পেরে কিছুই বলতে দিলো না। ঠিক করলাম বুড়িকে আমি এখান থেকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি করাবো।

থলেগুলো জিপে রেখে ঘরে ফেরার পর বুড়ি বললো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, জানি না সব কথা তোমাকে বলে যেতে পারবো কি না। তুমি তুমি তোমার টর্চ আর বন্দুকটা ঘরে নিয়ে এসো। জিপটা পার্ক করে রাখো। তারপর দরজা জানালা সব বন্ধ করে দাও।

বুড়ির কথা শুনে মনে হলো ভীষণ এক ভয় ওকে তাড়া করছে। কথা না বাড়িয়ে যা বললো তাই করলাম।

বুড়িও জানতে চাইলো বন্দুকটা লোড করা আছে তো? গুলি এনোছো বেশি?

বললাম, লোড করা আছে। দুটো চেম্বারে, আর চারটা বাড়তি আছে। গুলি কি আরো দরকার?

দরকার হতে পারে। আমি একা থাকলে কোন ভয় ছিলো না। তুমি আছো জানতে পারলে বিপদ আছে। দেখো তো শোয়ার ঘরে, জেমস – এর ড্রয়ারে এই বন্দুকেরই গুলি পাবে। যে কটা পাও নিয়ে এসো।

দেয়ালে একটা একনলা আরেকটা দোনলা বন্দুক ঝোলানো। দেরাজে অনেকগুলো গুলি। বেছে আমার বন্দুকের জন্য গোটা ছয়েক পেলাম। বসার ঘরে আসতেই বুড়ি বললো, রাতে হয়তো সময় পাবে না। আমি খুশি হব তুমি যে রোষ্ট আর কেক এনেছো

সেখান থেকে একটু যদি খাও। বেশি খেয়ো না, তেষ্টা পাবে।

ঘড়ি দেখলাম, ছটা বাজে কাচের জানালার বাইরে আকাশে সন্ধ্যার ফ্যাকাশে আলো। চারপাশে বনে অন্ধকার জমেছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। তেমন একটা খিদে ছিলো না। তবু বুড়ির কথা মতো শসা আর টমাটো দিয়ে অর্ধেক রোষ্ট খেলাম, কেকও খেতে হলো। শসার একটা ভালো গুণ, যতক্ষণ পেটে থাকে তেষ্টা পায় না।

খাওয়া শেষ করে বুড়ির কাছে গিয়ে বসলাম। বললাম, আপনাকে কিছু খেতে দেবো?

বুড়ি বললো, তুমি আসার অল্প আগে আমি খেয়েছি। দিনে একবারই খাই।

আপনার খাবার আসে কোত্থেকে? জানতে চাইলাম আমি।

ও কথা থাক। আমার কথার মাঝখানে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। তুমি রাস্তা জানতে চেয়েছিলে। আমার বাড়ির পেছন দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। ডেডউডের ভেতর দিয়ে ছয় সাত মাইলের মত যেতে হবে। তারপর দেখবে একটা ফাঁকা মাঠ, রাস্তাটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। ডান দিকে যেও না, বামের রাস্তা ধরে মাইল দুয়েক গেলে সেন্ট ক্লেমেন্টস বলে ছোট্ট একটা শহর পাবে। তারপর অনেক ঘুরে মেরিল্যাণ্ড যেতে হবে। তবে ও পর্যন্ত যেতে পারলে তুমি নিরাপদ। এবার শোন আমার অভিশপ্ত জীবনের কথা।

বুড়ি বলতে শুরু করলো এক বিচিত্র কাহিনী।

বাবা মার অমতে জেমসকে বিয়ে করেছিলাম। ও আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করতো। ভীষণ বদমেজাজি ছিলেন বাবা। জেমসকে বিয়ে করেছি জানলে ওকে গুলি করে মেরে ফেলতেন। তাই ওকে নিয়ে মিনিসোটা, ডাকোটা, সিনসিনাটি ঘুরে কোথাও সুবিধে করতে না পেরে চলে এলাম ভার্জিনিয়া। একেবারে পানির দরে তিনশ একর জমি কিনে ফেললাম। খামার বানালাম, গরু পুষলাম, বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানালাম। বছর চোদ্দ পনেরোর ভেতর জমজমাট কারবার জমিয়ে ফেললাম। তখন আমাদের কাউহ্যান্ডই ছিলো জনা ষাটেক। আর সব কর্মচারী মিলিয়ে শ--- এর ওপর হবে।

র‍্যাঞ্চ বড় হলো, জমি বাড়াবার দরকার হলো, আশে পাশে কেউ বিক্রি করবে না, জেমস ঠিক করলো, ডেডউড ফরেষ্টে লিজ নেবে গভর্মেন্টের কাছ থেকে। লোকে অনেক কথা বললো, এ বন নাকি অভিশপ্ত। কেউ ভেতরে গেলে ফিরে আসে না। আমরা কিছুই শুনি নি। জেমস বলতো আমাদের সৌভাগ্য দেখে ওদের হিংসে হচ্ছে।

জঙ্গল কিনে শুরু হলো গাছ কাটা। তখনই টের পেলাম বড় ভুল করে ফেলেছি। যারা গাছ কাটতে গিয়েছিলো সাত দিন পর পর একজন করে নিখোঁজ হতে লাগলো। প্রথমে ভাবলাম ভাড়া করা লোক, না বলে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের অতি বিশ্বাসী ফোরম্যান ডেভিড যেদিন ফিরে এলো না, সেদিন পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়ালো। একদিন গাছ কাটতে গিয়ে মানুষের হাড় গোড় পওয়া গেল মাটির তলায়। গাছ কাটার জন্য যাদের ভাড়া করা হয়েছিলো তারা সবাই বেঁকে বসলো। জেমস অনেক বোঝালো। শেষে রেগে মেগে ওদের পাওনা গন্ডা বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিলো। লোকজন

বলাবলি করতে লাগলো, ডেডউড এর জঙ্গল নাকি পুরোনো এক গোরস্থানের ওপর বেড়ে উঠেছে। এমনও শুনলাম, কোন গাছে কোপ দেয়ার পর লাল রক্ত বেরিয়েছে। যারা গাছ কাটতে এসেছিলো। তারা সেন্ট ক্লেমেন্টস গিয়ে এসব বলাতে গাছ কাটার লোক আর পেলাম না। ঠিক করলাম খামার না বাড়িয়ে যা আছে ও দিয়েই কারবার চালাবো। জেমস অবশ্য টাকা পয়সা হাতে আসার পর একটু বেশি উচ্চাকাঙ্খী হয়ে পড়েছিলো। ও বেশি টাকা দিয়ে দূর থেকে গাছ কাটার জন্য লোক আনতে লাগতো। অঘটনও আগের নিয়মে ঘটতে লাগলো। ঠিক সাত দিন পর পর একটা করে লোক নিখোঁজ। একবার তদন্ত করার জন্য শেরিফ পর্যন্ত এসেছিলো। জেমস বললো, না বলে পালিয়ে গেলে আমি কি করবো। জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে হারিয়ে যাওয়া লোকগুলো কোন হাদিশ পাওয়া গেলো না।

নতুন লোক না পেয়ে জেমসের মেজাজ বিগড়ে গেলো। পুরোনোদের ওপর হম্বি তম্বি করতে লাগলো, গালাগালি দিতো অকথ্য ভাষায়, ওরা কেন যায় না গাছ কাটতে। একে একে পুরোনো লোকেরাও বিদেয় নিতে লাগলো। যে খামার গড়ে উঠতে এত বছর লেগেছিলো,ভাঙতে দু বছরও লাগলো না। কম দামে গরু বিক্রি করে দিতে হলো। ঘোড়া ধরা বন্ধ হয়ে গেলো। আমাদের খামারের নাম হয়ে ডেডউডের অভিশপ্ত খামার।

লোকজন সব চলে গেলেও অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন ছিলো। কিছু জমি ওরা চাষ করতো, গরুও কিছু ছিলো। দিন কেটে যাচ্ছিলো। একদিন সকালে জেমস আর আমি ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে বনের একটু গভীরে চলে এসেছিলাম। বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামলাম। সে জায়গায় জঙ্গল একটু ফাঁকা ছিলো। চারপাশে দেখছি। হঠাৎ একটা অচেনা গাছের দিকে চোখ পড়তে আমি চমকে উঠলাম। গোড়াটা দেখতে অবিকল মানুষের আকৃতির মত। চোখ, নাক, মুখের আদল পর্যন্ত আছে। জেমসকে ডেকে দেখালাম। ও বললো, দারুণ জিনিষ তো। কেটে নিয়ে ড্রইং রুমের কোণায় সাজিয়ে রাখলে চমৎকার ভাস্কর্য মনে হবে। তুমি এখানটায় থাকো। আমি এক্ষুণি গিয়ে হ্যারি কিম্বা লীকে ডেকে আনছি।

জেমস চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বাতাস এক পশলা বাতাস বয়ে গেলো। গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ হলো। আমি স্পষ্ট শুনলাম ফিশ ফিশ করে কে যেন বললো, ডেভিড, ডেভিড! চমকে উঠলাম। ডেভিড আমাদের হারিয়ে যাওয়া ফোরম্যান। নিজের ছেলের মত ভালোবাসতাম ওকে। গাছটার কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম মুখের মত দেখতে যে জায়গাটা, কোথায় যেন ডেভিডের চেহারার সঙ্গে মিল আছে।

জেমস এলো, সঙ্গে কুড়াল হাতে হ্যারি। জেমসকে বললাম, এ গাছটা কেটো না। এটাকে দেখে আমার ডেভিডের কথা মনে হচ্ছে। জেমস আমার কথা শুনলো না। ঠাট্টা করে বললো, গাছ দেখে তোমার ডেভিডের কথা মনে পড়লো, একদিন মেঘ দেখে বললে ডেভিডের মত লাগছে। তোমার বুদ্ধির বরিহারি। ঠিক আছে এক ভাস্কর্যটার নাম দেবো ডেভিড, তাহলে হবে তো?

এরপর ও হ্যারিকে বললো গাছ কাটতে। গাছের গোড়ার কয়েকটা কোপ দিয়েই

হ্যারি চিৎকার করে উঠলো – মিঃ জেমস, এদিকে দেখুন।

আমি আর জেমস কাছে গিয়ে দেখলাম, গাছের কাটা জায়গা থেকে ধীরে ধীরে টক টকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে। জেমস হাতে করে নিয়ে শুকে দেখলো। ভয় পাওয়া গলায় বললো; একবারে তাজা রক্ত।

আমি হ্যারিকে বললাম, গাছের কাটা জায়াগায় মাটি দিয়ে লেপে দাও। আমার বুঝতে বাকি রইলো না, আমাদের ডিভিড কোন অদৃশ্য শক্তির অভিশাপে গাছে রূপান্তরিত হয়েছে। চোখের পানি মুছে ডেভিডের গায়ে হাত রাখলাম। বললাম, আমি দুঃখিত ডেভিড। জেমসকে ক্ষমা করে দিও। আমি রোজ এসে তোমাকে দেখে যাবো।

এ ঘটনার পর হ্যারিও খামার ছেড়ে চলে গেলো। মাস খানেক পর জেমস একদিন ডাক্তারের কাছে গেলো, নখে কি অসুখ হয়েছে। হাতের নখ সব মরে যাচ্ছে। ডাক্তার বললো, খুব খারাপ ফাঙ্গাস হয়েছে। কোন অবস্থায় যেন মাটি না লাগায়। ওষুধ দিয়েছিলো। কাজ হলো না। আস্তে আস্তে নখের ফাঁক দিয়ে শেকড় গজাতে শুরু করলো। ডাক্তার ওষুধ দিলো , দু' বার অপারেশন করলো, কিছুই হলো না।

সারাক্ষণ মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতো জেমস। হাতে গ্লাভস পরে থাকতো। একদিন লী বললো, রাতে ও দেখেছে দুটো গাছ আমাদের আঙিনার ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেছে। আমি কয়েক রাত বসে থেকে কিছু দেখলাম না। কয়েক মাস পর লী আর হার্ভে আবার ওই জিনিষ দেখলো। ডেডউড বনের গাছগুলো হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের আর আটকে রাখা গেলো না। কয়েক বছরের ভেতর আমাদের খামার একেবারে বিরান হয়ে গেলো। বুড়ো হার্পার ছাড়া আর কেউ রইলো না।

জেমসের হাতের ফাঙ্গাস পায়েও ছড়ালো। নখের গোড়া দিয়ে শেকড় গজালো। পায়ের চামড়া বাকলের মতো শক্ত হয়ে যেতে লাগলো। আমি প্রায়ই ডিভিডের কাছে গিয়ে কাঁদতাম। ঈশ্বরকে ডাকতাম। এ অভিশাপ থেকে কি কেউ বাঁচবো না।

জেমস অনেকদিন ভুগেছিলো। বছর কুড়ি তো হবে। মারা গেছে বলবো না, পুরোপুরি গাছ হয়ে গেছে, আজ বছর তিনেক হলো। হার্পারও মারা গেছে। না, ও গাছ হয় নি। ওর বয়স হয়েছিলো অনেক।

সমোহিতের মতো এতক্ষণ মিসেস জেমসের কথা শুনছিলাম। রাত তখন বারোটার মত। একটু থেমে বুড়ি আবার বললো, বুঝতে পারছি, তোমার মনে অনেক প্রশ্ন। হ্যাঁ, মনের কথা জেমস টের পেতে শুরু করেছিলো, মারা যাওয়ার বছর পাঁচেক আগে থেকে। তখন ও মানুষের খাবার খেত না। মাটি আর পানি খেতো। রোদে বসে থাকতো। বলতো, রোদের ভেতর আমাদের খাবার রয়েছে। একদিন বললো, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আরাম লাগে জঙ্গলে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে। ইচ্ছে হয় ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাই। প্রায়ই জঙ্গলে চলে যেতো। শেষ দিন বললো, তুমিও শিগগিরই আমার সঙ্গী হবে। কারণ আমি জানি আমাকে ছেড়ে তুমি বেশি দিন থাকতে পারবে না। তবে হার্পার যতদিন আছে ওকে বোলো আমি হারিয়ে যাওয়ার পর ও যেন ঘুনাক্ষরেও এখানকার পানি মুখে না দেয়। তুমি কি ভাবছো আমি জানি। হ্যাঁ,

তাড়াতাড়ি আসতে পারবে, যদি পেছনের ডোবার সবুজ পানি নিয়মিত খাও।

সেদিন জঙ্গলে গিয়ে জেমস আর ফিরে এলো না। আমি ওর কথা মত সবুজ পানি খেতে শুরু করলাম। এক বছরের ভেতর আমার পায়েও শেকড় গজানো শুরু করলো, গত বছর থেকে শুধু পানি খেয়ে আছি। অন্য কিছু খেতে ভালো লাগে না। হার্পার সব জানতো। এত বিশ্বস্ত ছিলো যে, ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও পারতো না।

এই ডেডউড ফরেষ্টে ডেভিড আছে, জেমস আছে, আরো কিছু ভালো গাছ আছে। তবে বেশির ভাগই হচ্ছে খারাপ। শয়তানের কথায় ওরা চলে। ওরা যদি–

মিসেস জেমসের কথা শেষ হলো না হঠাৎ সারা বাড়ির বাতি নিভে গেলো। চাপা গলায় বুড়ি বললো, টের পেয়ে গেছে। হারিকেনের কাছ থেকে নড়বে না।

ওরা কারা? জানতে চাইলাম আমি।

বুড়ি ফ্যাঁশফ্যাশে গলায় বললো, অভিশপ্ত গাছেরা। যাদের আমরা কেটেছিলাম।

বাইরে ধুপধাপ শব্দ হতে লাগলো। আকাশে জ্যোৎস্না ছিলো। চাঁদের আলোয় দেখলাম গোটা ডেডউড ফরেষ্ট বাড়িটাকে ঘিরে ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। বুড়ি ব্যস্ত গলায় বললো ফায়ার প্লেসে আগুন ধরাও।

কাঠ চাপানোই ছিলো। কিছুক্ষনের মধ্যেই ফায়ার প্লেসের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আগুনের ছায়া দেখে অল্পক্ষণের জন্য গাছগুলো থমকে দাঁড়ালো। তারপর আবার উল্টো দিক দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

বুড়ি বললো, তুমি আমার কাছে থাকো। যা বলি তাই করবে। যদি বলি আমাকে রেখে সারা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দাও, তাই করবে। তোমার কোন ক্ষতি হতে দেবো না। আজ রাতে একটা ভালো মেয়ে তোমার অপেক্ষায় ছিলো।

ফায়ার প্লেসের আগুন কমে আসতে আরো কাঠ চাপালাম। কাঠ শেষ হওয়ার পর বুড়ি বললো, চেয়ার টেবিল যা আছে ভেঙ্গে ওখানে দাও।

হঠাৎ ভীষণ জোরে কে যেন বাড়ির ছাদে আঘাত করলো। গোটা বাড়ি থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

বুড়ি কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, মশাল, মশাল বানাও তেলে কাপড় ভিজিয়ে।

বাড়ির চারপাশে ভীষণ শব্দে গাছের তাণ্ডব নৃত্য চলছে। আমার ভয় হচ্ছিলো জিপটাকে নিয়ে। বুড়ির কথা মত চারটা মশাল বানালাম। এমন সময় ঝন ঝন করে শোয়ার ঘরের জানালার কাঁচ ভাঙলো। তাকিয়ে দেখি অজগরের মত মোটা সবুজ একটা লতা কিলবিল করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

বন্দুক কোথায়? ফ্যাঁশফ্যাশ গলায় চিৎকার করলো বুড়ি। আমি তক্ষুণি বন্দুক তুলে গুলি করলাম। দু"টুকরো হয়ে গেলো রাক্ষুসে লতা। হিল হিল করে গোড়ার দিকটা বাইরে চলে গেলো কাটা টুকরোটা ঘরের মেঝের ওপর তড়পাতে লাগলো। সবুজ রসে ভেসে যাচ্ছিলো সারা মেঝে।

বুড়ি বললো, সাবধান, গাছের রক্ত যেন গায়ে না লাগে।'

এরপর আবার ছাদের ওপর বাড়ি মারলো কেউ। মচ মচ করে ছাদ ভেঙে পড়লো

দু হাতে মশালকে লাঠির মতো ব্যবহার করে গাছগুলোকে তাড়াছিলো----

একপাশে। বুড়ি ব্যস্ত গলায় বললো, আর সময় নেই। আমার হাতে দুটো মশাল ধরিয়ে দাও। একটা মশাল জ্বেলে ভাঁড়ার ঘর থেকে তেলের টিনটা আনো। তোমাকে গাড়ি নিয়ে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। মনে রেখো ওরা আগুন আর আলোকে শুধু ভয় পায়।

মশাল হাতে ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে তেলের টিন আনলাম। বুড়ির হাতের মশাল জ্বেলে দিলাম। বললাম, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আপনি না গেলে আমি যাবো না।

বুড়ি রহস্যময় হেসে বললো, ঠিক আছে, চল। আমি জানি আমার গন্তব্য কোথায়।

আমি এক হাতে বন্দুক আর টর্চ নিলাম। আরেক হাতে একটা মশাল আর তেলের টিন। বুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম গাড়ি পর্যন্ত হেটে যেতে পারবেন?

বুড়ি পারবো বলে উঠে দাড়ালো।

তখনই ছাদের ওপর আরেকটা বাড়ির শব্দ হলো। শোয়ার ঘরের ছাদ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়লো। আমি দরজা খুলতেই বুড়ি বললো। আমি আগে যাচ্ছি, তুমি বাড়ির দরজায় আর বারান্দায় তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দাও।

তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে টিন খালি করে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। বুড়ি ততক্ষণে জিপে গিয়ে পেছনের সিটে বসেছে। দুই হাতে দুটো মশাল জ্বলছে। আশে পাশের গাছগুলো দূরে সরে গেছে।

আমি গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম। ততক্ষণে বাড়ির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। গাড়ির হেড লাইট জ্বালাতে সামনের গাছগুলো সরে গেলো। জোরে গাড়ি চালিয়ে বাড়ির আঙিনা থেকে বেরিয়ে এলাম। বুড়ি বললো বেশি জোরে চালাবে না, মশাল নিভে যাবে। দু হাতে মশালকে লাঠির মতো ব্যবহার করে গাছগুলোকে তাড়াচ্ছিলো বুড়ি।

গাড়ির কাচে মাঝে মাঝে মোটা লতা এসে বাড়ি দিচ্ছিলো যখন বুড়ি পেছনের গুলো সরাতে ব্যস্ত। একহাতে ষ্টিয়ারিং আরেক হাতে টর্চ জ্বালিয়ে ওগুলোর উৎপাত থেকে রক্ষা পেলাম।

গাড়ি খুবই আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছিলো। রাস্তার কোন নাম নিশানা নেই। শুকনো পাতা পড়ে খানাখন্দ সব ঢেকে আছে। বেকায়দা কোন গর্তে যেন না পড়ি সেজন্যে বেশি সাবধান হতে হচ্ছিলো।

পেছনে হঠাৎ এক লতার বাড়ি খেয়ে বুড়ি গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লো। আমি গাড়ি থামাতেই বুড়ি চিৎকার করে উঠলো, তোমর ঈশ্বরের দোহাই, এখান থেকে চলে যাও। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। সাবধান, ওপরে তাকাও।

তাকিয়ে দেখি ওপর থেকে অক্টোপাসের শুঁড়ের মত একটা লতা নেমে আসছে। বন্দুক তুলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম। বুড়ি আবার বললো, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি এখন যাও। আমাকে জেমসের কাছে থাকতে দাও।

কান্না চেপে বুড়িকে ফেলে রেখে গাড়ি ছাড়লাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি বুড়ি হাত

নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো। তারপর মশাল দুটো ছুঁড়ে দিলো শুকনো পাতা আর মরা ডালের স্তুপে। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষুসে লতা ওকে জড়িয়ে ধরলো। আমি এক হাতে ষ্টিয়ারিং আরেক হাতে টর্চ জ্বালিয়ে চারপাশে আলো ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চললাম। একটু পরেই দেখলাম, পেছনে আলোর আভা। বুঝলাম ডেডউড ফরেষ্টের দাবানল।

শেষ রাতে কিভাবে যে গাড়ি চালিয়ে সেন্ট ক্লেমেটস এসেছিলাম মনে নেই। ততক্ষণে ডেডউড ফরেষ্টের দাবানলে পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে গেছে।

মেরিল্যাণ্ড ফিরে তারপর দিনই চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। প্যাটদের স্বার্থপরতার জন্য সত্যি খারাপ লাগছিলো। মার্থার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে মেক্সিকোর ট্রেনে চাপলাম সাত দিন পর।

এই বলে রাঙা দাদু থামলেন। আলবোলার নলে টানতে গিয়ে দেখলেন আগুন নিভে গেছে। শামু বললো, বুড়ির দেয়া সোনার গিনিগুলো কি করলে দাদু?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাঙাদাদু বললেন, সবগুলো মেরিল্যান্ডের ওল্ডমেন হোমে দান কর দিয়েছি। বুড়ির কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

রাঙাদাদু আসলে কে

বড়দিনের ছুটিতে ফি বছর শামুদের বাড়ির সবাই সারা দিনের জন্য পিকনিকে যায়।

ছোটদের ছুটির তো হিসেব নেই, পুরো ডিসেম্বর মাসটাই ওদের জন্য ছুটি। স্কুলে নতুন ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারীর মাঝামাঝি। বড়রা যারা অফিসে যায়, তাদের ছুটি থাকে বড় দিনে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শামুরা এর ব্যতিক্রম দেখে নি।

পিকনিকের বাজার করার ভার থাকে ছোড়দাদুর ওপর। অন্য সময়ে ছোড়দাদুর সঙ্গে বাজারে যাওয়ার জন্য শামুদের সে কি উৎসাহ! অথচ সেবার ছোড়দাদু যখন পিকনিকের আগের দিন জিজ্ঞেস করলেন আমার সঙ্গে কে কে যাবে, শামুরা একে অপরের দিকে তাকালো। রাঙাদাদু সেদিন দোয়া পড়ে বাড়ি বন্ধ করবেন, যাতে খবিস কোন জ্বীন কখনও উৎপাত না করে। এ কদিনে তিনি কয়েক বারই টের পেয়েছেন, এ বাড়িটার ওপর খারাপ কিছুর নজর আছে। থাকবে না কেন? রাঙাদাদু বলেন, বাড়িতে বুড়ো বুড়ি কয়েকজন ছাড়া তো আল্লাখোদার নাম নিতে দেখি না কাউকে। বদনার বাপ শুনে তড়বড় করে বলেছিলো, আঁই লই। আঁই হাঁচ ওয়াক্ত নআজ হড়ি। রাঙাদাদু বললেন, তোর মতো আফিম খোরের নামাজ আল্লাপাক কবুল করবেন কি না আমার ঢের সন্দেহ আছে।

ছোড়দাদুর সঙ্গে শামুদের কেউ বাজার করতে যায় নি। এতে ছোড়দাদু খুব একটা অখুশি হন নি। বড় বিবিদাদুকে বলেছেন, পিচকিগুলোকে সামলাতে গিয়ে জরুরি কোন জিনিষটা ভুলে যাই– থাক ওরা রাঙাদার কাছে। বড় বিবিদাদু বললেন, রাঙা যে ওদের কি যাদু করেছে কে জানে। দেখি কাল ওরা কি করে। রাঙা তো বলেছে কাল পিকনিকে যাবে না। বাড়ি বন্ধ করার পর সাতদিন নাকি ও নড়তে পারবে না কোথাও।

রাঙাদাদু আগের দিন সুত্রাপুরের বাজার থেকে ছোট ছোট একুশটা মাটির ঘড়া এনেছিলেন। একুশটা কাগজে কি সব দোয়া লিখে ভাঁজ করে ঘড়ার ভেতর রাখলেন। তারপর সিংদরজা থেকে পাঁচিলের গা ঘেঁষে কিছু দূর পর পর হিসেব করে একুশটা জায়গায় দাগ দিলেন। বদনার বাপকে বললেন, দাগ দেয়া জায়গায় সোয়া হাত গভীর,

ও দাদুরে, ও মারে, ইয়া কত্তুন আইলো রে----

সোয়া হাত মুখে একুশটা গর্ত খুঁড়তে।

ছোটরা সবাই ঝুল বারান্দার নিচে সিঁড়িতে বসে রাঙাদাদুর কাণ্ড কারখানা দেখছিলো। ঘড়ার গায়ে সাদা রঙ দিয়ে কি সব চিহ্ন দিতে দিতে রাঙাদাদু বললেন, কেউ যদি কখনও এগুলো মাটি খুঁড়ে না তোলে তাহলে একুশ বছরের জন্য তোরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারিস। কোন খাবিস চিজ তোদের কারো কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

শামু বললো, আমরা না হয় তুলবো না। কিন্তু খাবিস জ্বীন নিজে যদি এসব তুলে ফেলে দিয়ে আমাদের ক্ষতি করতে আসে?

না, ওরা তা পারবে না। রাঙাদাদু গম্ভীর হয়ে বললেন, যে দোয়া লিখেছি, তার দশ হাতের ভেতর ওরা কেউ আসতে পারবে না।

বদনার বাপ পাঁচিলের ধারে গর্ত খুঁড়ছিলো। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো– ও দাদুরে, ও মারে ইয়া কত্তুন আইলো রে!

রাঙাদাদুর সঙ্গে শামুরা সবাই ছুটে গেলো বদনার বাপের কাছে। পুরোনো জামগাছের তলায় হতভম্ব হয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে বদনার বাপ। পাশে নতুন খোঁড়া গর্ত। শাবলটা গর্তের সঙ্গে রাখা। শাবলের কাছে ওটা কি? শামুদের সবার চোখ ছানা বড়া হয়ে গেছে। নরকঙ্কালের আস্ত একটা খুলি পড়ে আছে সেখানে। ওটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে বদনার বাপ। বললো, মাটি খুঁড়তে গিয়ে নাকি ওটা বেরিয়েছে।

রাঙাদাদু লাঠি দিয়ে ওটাকে উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন, গুপ্তধন পাহারা দেয়ার জন্য আগের দিনে এভাবে ছোট ছোট ছেলেদের মেরে মুণ্ডুটা কেটে পুঁতে রাখতো। এভাবে মারলে ওরা যখ হয়ে গুপ্তধন পাহারা দেয়।

শামু জানতে চাইলো- তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের বাড়িতে গুপ্তধন আছে?

রাঙাদাদু গম্ভীর হয়ে বললেন, থাকাটা অসম্ভব নয়! তবে ওটাকে গুপ্তধন না বলে যখের ধনই বলা উচিৎ। নাহ, এটা দেখি ঝামেলা বাড়িয়ে দিলো। কাল আরেক দফা বন্‌ধ্ করতে হবে। এরপর তিনি বদনার বাপকে নিয়ে কঙ্কালের খুলিটাকে নিয়ম মত কবর দিলেন। ওটার রুহের মাগফেরাতের জন্য অনেক দোয়া দরুদ পড়লেন।

সেদিন রাতে আর গল্পের আসর জমলো না। রাঙাদাদুই মানা করলেন। তিনি সাত দিনে এক লক্ষবার কুলহুয়াল্লা পড়ে সারা বাড়ি চক্কর দেবেন। সবাইকে মানা করলেন, এশার নামাযের পর কেউ যেন বাড়ির বাইরে না আসে। দরজা জানালাগুলো বন্ধ রাখতে বললেন। সবাই নির্বিচারে এসব নির্দেশ মেনে নিলো। শুধু বড় বিবিদাদুকে শামু একবার বলতে শুনলো, রাঙাবাড়াবড়ি করছে।

পরদিন ভোর না হতেই সবাই উঠে পড়লো। পিকনিকের সব কিছু আগের রাতেই গোছানো ছিলো। রাঙদাদুর কাছ থেকে ছোড়দাদু জেনে এসেছেন এ সময় বেরোতে

অসুবিধে নেই বদনার বাপ পিকনিকে যাচ্ছে না। রাঙাদাদু সাতদিন রোজা রাখবেন বলে সেও ঠিক করেছে রোজা রাখবে।

আট রিক্সা বোঝাই করে মানুষ আর জিনিষপত্র নিয়ে ছোড়দাদু মিল ব্যারাকের ঘাটে গেলেন লঞ্চে ওঠার জন্য। সেবার ঠিক হয়েছিলো তালতলি যাওয়া হবে। রাঙাদাদু বারবার বলেছেন,তোমরা যেখানেই যাও এশার নামাযের আগে ফিরবে।

বুড়িগঙ্গা কুয়াশার ভেতর হাঁসের ডিমের কুসুমের মত সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে আর গরম চায়ের সঙ্গে মুড়ির মোয়া খেতে খেতে তালতলি এসে গেলো। পিকনিকের জায়গা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন ছোড়দাদু। অন্য সব বারের মত দারুণ মজা হলো পিকনিকে। সারাটা দিন যেন চোখের পলকে কেটে গেলো। বিকেলে চা খেয়ে রওনা হতে হতে সূর্য পাটে বসেছে।

এশার নামাযের আগে বাড়ি ফিরতে পেরে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। রাঙাদাদু সাবার ভেতরই ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন ভালো মত। রিক্সা থেকে সিং দরজার সামনে নেমে ভুরু কুঁচকালেন বড় বিবিদাদু। গজ গজ করে বললে, রাঙাকে এতবার বলেছি বাইরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিতে । বসার ঘর ছাড়া কোথাও আলো নেই। এ আবার কোন বুজরুকি!

সবার আগে বড়দাদু আর বড় বিবিদাদু বাড়িতে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে শামু আর ছোটন। বৈঠক খানায় ঢুকে ওরা ভেবেছিলো রাঙাদাদুকে দেখবে। কিন্তু না, তাঁর বদলে গড়িমোড়া চেয়ারে বসে আছেন অনেকটা তাঁরই মতো সাদা চুলদাড়ি ওয়ালা এক বুড়ো। চেহারায় বিরক্তির ছাপ। বড়দাদুকে দেখে দাঁড়ালেন। অভিযোগের গলায় বললেন, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে বড়দা? দুপুর থেকে বসে আছি, সারা বাড়িতে জন মানুষ কেউ নেই। এভাবে বাড়ি খালি রেখে কেউ যায়! ডাকাত এসে সব নিয়ে গেলেও তো দেখার কেউ ছিলো না।

বড়াদাদু অবাক হয়ে বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? আপনি কি হাবুর কাছে এসেছেন?

শুধু হাবুর কাছে আসবো কেন? একটু অভিমানভরা গলায় বুড়ো বললেন, আমি তোমাদের সবার কাছে এসেছি। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না বড়দা?

একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে! বড়দাদু ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করলেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? আপনি কি খিদিরপুরের গনু হালদার!

বুড়ো ভাঙা গলায় বললেন, বড়দা, সত্যি আমাকে চিনতে পারো নি? আমি রাঙা!

এতক্ষণে বাড়ির সবাই এসে বৈঠক খানায় জড় হয়েছে। বুড়ো যখন বললেন– আমি রাঙা,সবার চোখ তখন কপালে উঠেছে।

বড়দাদু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন এসব কি বলছেন? আপনি কেন রাঙা হতে যাবেন?

আমি রাঙা, আমি রাঙা হবো না তো কে রাঙা হতে যাবে? ষোল বছরে আমি কি এতই বদলে গেছি বড়দা? কি রে হাবু, তুইও আমায় চিনতে পারিসনি? আ মলো. অমন হা করে দেখছিস কি, তোরা কি আমার মরার খবর পেয়েছিলি নাকি!

না, মানে– আপনি– ছোড়দাদু কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

এবার বুড়ো তাঁকে ধমক লাগালেন–অমন খাবি খাচ্ছিস কেন? দেবো নাকি এক চড়ে রাধা চক্কর দেখিয়ে?

তাইতো! পকেট থেকে চশমা বের করে ছোড়দাদু লাগিয়ে বললেন, কথা শুনে তো রাঙাদাই মনে হচ্ছে। ছোটবেলায় রাঙাদা আমাকে এভাবে চড় মারার কথা বলতো তু - তুমি যদি রাঙাদা হবে, তাহলে,ও কে?

ও-কে মানে? অবাক হয়ে বুড়ো বললেন, ও–টা আবার কে?

মানে দিন দশেক ধরে রাঙাদা তো এ বাড়িতে আছে।

কি বলছিস হাবু? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? চেঁচিয়ে উঠলেন বুড়ো,–আজ দুপুরে আমি এলাম বাগদাদ থেকে সাত দিন আগে টেলিগ্রাম পাঠালাম, আমি কোন দুঃখে দশ দিন আগে আসতে যাবো? তোদের মতলব তো ভালো মনে হচ্ছে না? ভেবেছিস বুঝি বাপ দাদার সম্পত্তির ভাগ চাইতে এসেছি?

বড়দাদু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, আহ্, এত চ্যাঁচামেচির কি আছে! ভেতর থেকে রাঙাকে ডাকলেই তো সব বোঝা যাবে। এই ছোঁড়া, যাতো রাঙাদাদুকে ডেকে আন।

ভীষণ উত্তেজনায় শামুদের বুকের ভেতর ঢিব ঢিব করছিলো। এক ছুটে রাঙাদাদুর ঘরে গিয়ে দেখে তিনি নেই। গলা তুলে ডাকলো কয়েকবার। ছাদে গিয়েও দেখলো। কোথাও তাঁকে পেলো না। ফিরে এসে বাড়দাদুকে বললো, রাঙাদাদু কোথাও নেই।

বুড়ো বললেন, এসব কি কাণ্ড! কেউ বুঝি রাঙা সেজে তোমাদের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে? দুপুর থেকে বসে আছি, কাক পক্ষীটিও তো দেখলাম না।

বড় দাদু আবার শামুদের বললেন, বদনার বাপকে ডেকে আন।

শামুরা ছুটলো বদনার বাপকে ডাকতে। বড় বিবিদাদু একটু কাছে এসে বুড়োকে বললেন, তুমি যদি রাঙা হও, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। পিঠের দিকে জামাটা তোলো তো ভাই।

বুড়ো একগাল হেসে জামা তুলে বললেন, বুঝেছি ভাবী, বড়দার খড়মের দাগ দেখবে বুঝি! ও দাগ জন্মেও মুছবে না।

বুড়োর পিঠে ঠিকই কালো কাটা দাগ। বড় বিবি দাদু রায় দিলেন, কোন সন্দেহ নেই, তুমিই রাঙা। বোসো সবাই। হই চই করার দরকার নেই। ওকে আগে আসতে দাও। পরশু যখন রোদে বসে খালি গায়ে তেল মাখাচ্ছিলো, পিঠে দাগটা না দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও রাঙা পিঠের দাগ কোথায়। ও বুঝতে পারে নি, বললো কিসের

দাগ। আমি বললাম কেন ভুলে গেলে নাকি খড়মের দাগ? ও একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, তাই বলো, সে তো কবে মুছে গেছে। ইন্দোনেশিয়াতে কি এক মলম লাগিয়ে নাকি ওটা মুছেছে। আমি ভাবলাম হবে হয়তো।

আসল রাঙাদাদু ভেজা গলায় বললেন, কোন দুঃখে মলম লাগিয়ে দাগ মুছবো ভাবী? পিঠে হাত বুলিয়ে যখন দাগটা ছুঁই, তখন যে আমার বড়দার কথা মনে পড়ে। বাবা মারা যাওয়ার পর বড়দাই তো বাবার মতো করে মানুষ করেছিলেন। বলতে বলতে তিনি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

বড় দাদুও তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। রাঙাদাদুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তাই যদি জানতি, এতদিন রাগ করে কেন দূরে সরে ছিলি ভাই? তোর কথা ভেবে কত রাত কেঁদেছি। আল্লাকে বলেছি, মরার আগে ভাইটার দেখা পাবো তো!

দুই দাদুর কান্না দেখে সবাই একসঙ্গে কেঁদে উঠলো। ছোড়দাদু কাঁদতে কাঁদতে রাঙাদাদুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কত বছর পর তুমি আমাকে চড় মারার কথা বললে রাঙাদা। বড়দার সামনেই বলছি, গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, একদিনও কি মারার কথা বলেছে?

বড়দাদু চোখ মুছে হেসে ফেললেন– হ্যাঁ, আরো বলি আর কি! একজন কে মারার ফলতো জীবন ভর ভোগ করলাম। কোন আক্কেলে তোকে মারার কথা বলি?

রাঙাদা বললেন, ও কথা আর বোলো না বড়দা। তোমাদের ছেড়ে আমি আর কোথাও যাবো না। ঢের দেখেছি। যে কদিন বেঁচে আছি বৌমাদের সেবা খাবো, নাতি নাতকোরদের নিয়ে গল্প করে দিন কাটাবো। এতগল্প জমে আছে এ জন্মে বলে শেষ করা যাবে না। বড় বৌ মা, বুড়ো ছেলেটাকে কিছু খেতে দাও। সারাদিন পেটে দানা পানি পড়েনি মা।

রাঙাদাদুর কথা শুনে মা, জেঠিমা, কাকিমা সবাই জিব কেটে রান্নাঘরে ছুটলো। বড় বিবি দাদু বললেন,পরের বাড়িতে তো আসো নি রাঙা। রান্নাঘরে জালের আলমারি ভর্তি খাবার। নিয়ে খেতে কি হয়েছিলো?

কি করে জানবো কোথায় রান্নাঘর? এমনি তো দুপুর বেলা এসে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে বৈঠক খানায় ঢুকে আরাম চেয়ারে বসে সিটিয়ে আছি, কেউ আবার না চোর ডাকাত ভেবে চ্যাঁচামেচি করে!

বড় বিবিদাদু বললেন, আমি অবাক হচ্ছি ও আমাদের এত কথা জানলো কিভাবে?

রাঙাদাদু বললেন, বুঝেছি, ওটা কি আমার মত দেখতে? বেশি ফর্শা, কপালে কাটা দাগ আছে?

সবাই অবাক হয়ে সায় জানালো। রাঙাদাদু বললেন, আর বলতে হবে না। ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো ত্রিনিদাদে। মালদহ না বহরমপুর বাড়ি বললো। আমার মতো ভবঘুরে, বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। আমার কোন কথা ওকে বলতে বাকি ছিলো না। চোহারায়

মিল ছিলো বলে বিদেশীরা ভাবতো ও বুঝি আমার ভাই। সেই থেকে শুরু হলো বাটপারি। আমার সঙ্গে থাকতো, আমার কথা বলে পরিচিতদের কাছ থেকে এটা সেটা আনতো। কত মানা করেছি, শোনে নি। শেষে একদিন দিলাম দূর করে তাড়িয়ে। জানতো আমি কখনো বাড়ি আসবো না। সে সুযোগটাই নিয়েছে।

তা নকল রাঙা বাবু গেলেন কোথায়? আর তার হুক্কাবরদার বদনার বাপ? বড়দাদু শামুকে জিজ্ঞেস করলেন। শামু সব খুঁজে এসেছে। বললো, বদনার বাপ আর নকলদাদু দুজনই হাওয়া হয়ে গেছে। নকল দাদুর ঘরে সুটকেস নেই। বদনার বাপের বিছানা পত্তর কিছু নেই। ওর ঘরের মেঝেতে সাতটা বড় বড় গর্ত আর সাতটা পুরোনা পেতলের কলসি।

ছোড়দাদু শুনে অবাক হয়ে বললেন, তার মানে ওরা সত্যি সত্যি আকবরি মোহর পেয়ে ওগুলো চুরি করে পালিয়েছে? এক্ষুণি যে থানায় খবর দেয়া দরকার বড়দা?

বড়দাদু বললেন, আপদ বিদেয় হয়েছে। থানা পুলিশের ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই। আমাদের রাঙা ফিরে এসেছে। সাত ঘড়া কেন তা ওর জন্য একশ ঘড়া মোহর আমি বিলিয়ে দিতে পারি।